সাধারণতঃ দণ্ড অর্থে মাপকাঠি বুঝায়। ইহার পরিমাণ ৪ হাত বা ৪ গজ ধরা হইয়া থাকে। এখানে ১ দণ্ড ২০০০ হাতের সমান, সুতরাং এই দণ্ডের অর্থ মাপকাঠি নয়। এক দণ্ড কালে অর্থাৎ ২৪ মিনিটে সাধারণতঃ লোকে যে পরিমাণ পথ চলিতে পারে, সেই পরিমাণ পথের দৈর্ঘ্য বুঝাইতে কি এই 'দণ্ড'-সংজ্ঞা ব্যবহৃত হইয়াছে? হওয়া অসম্ভব নয়। অন্যত্রও এইরূপ নিদর্শন পাইয়াছি। ১৫২০ শকে লিখিত উত্তর-বঙ্গের কবি কবিবল্লভ-প্রণীত অপ্রকাশিতপূর্ব্ব রসকদম্ব * নামক গ্রন্থে অনেক স্থলে প্রহর শব্দ যোজন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা :—

বাহেত মানসোত্তর নাম মহীধর।
বলয়া আকার উচ্চ লক্ষেক প্রহর॥ (২৪২ শ্লোক)
মর্ত্ত্যলোকে বাস করে মনুষ্য সকলে
প্রহর পঞ্চাস কোটি দীর্ঘ পরিসরে॥ ( ২৪৬ শ্লোক )
প্রহর সহস্র দস উচ্চ মহীধর। ( ২৫২ শ্লোক )

কিতাবত-মঞ্জরির ৫৫ সংখ্যক পত্র হইতে শেষাংশে যুগপরিমাণ ও যুধিষ্ঠির হইতে ৩৩৮৪ কল্যব্দ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষীয় রাজগণের এক ধারাবাহিক তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে।

ক্রমশঃ

শ্রীতারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য

---

* গৌহাটির কটন কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম এ মহাশয় এই গ্রন্থখানি সম্পাদন করিতেছেন; শীঘ্রই উহা পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইবে, আশা করা যায়।

# ব্রহ্মা

## ব্রহ্মার উৎপত্তি, পূজা ও মূর্ত্তি

### ১। প্রাচীনতম সংস্কৃত-সাহিত্যে ব্রহ্মার বিভিন্নপ্রকার রূপ ও অবস্থা

ব্রহ্মন্ শব্দ, এমন কি, ব্রহ্মা শব্দও ঋগ্বেদের অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। অধিকাংশ স্থলেই তাঁহাকে দেবতাদিগের স্তুতি করিতে দেখা যায়। এই ব্রহ্মন্ বা ব্রহ্মা শব্দের সচরাচর অর্থ "যাজক" বা পুরোহিত। সায়নাচার্য্য এই অর্থে যে সকল শব্দ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইউরোপীয় পণ্ডিতেরাও সেই অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। † কেহ কেহ বলেন, এই ব্রহ্মন্ পুরোহিতেরাই ব্রাহ্মণাচ্ছংশিন্ নামে অভিহিত হইতেন। আবার কেহ কেহ বলেন, তাঁহারা হোতা-বিশেষ ছিলেন। ঋগ্বেদে তত স্পষ্ট দেখা যাউক আর না যাউক, পরে অর্থাৎ যজুর্বেদ ও অথর্ববেদে ব্রহ্মন্ বা ব্রহ্মা শব্দ একপ্রকার যাজকশ্রেণীবিশেষের উপর প্রযুক্ত হইত। ‡ ইহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, ঋগ্বেদে বা যজুর্বেদে কিম্বা অথর্ববেদে ব্রহ্মন্ শব্দে সৃষ্টিকর্ত্তা বুঝাইত না; বুঝাইত এক প্রকার ঋত্বিগ্‌বিশেষ,—হোম করাই তাঁহার কাজ। অথর্ববেদের ব্রহ্মাই যজ্ঞের পরিদর্শন-কারী ও নিয়ন্তৃক। §

আমাদের সৃষ্টিকর্ত্তা দেবতা ব্রহ্মার আর এক নাম প্রজাপতি। এই শব্দও ঋগ্বেদে কয়েকবার পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহাও সৃষ্টিকর্ত্তা প্রজাপতি অর্থে প্রয়োগ করা যায় না। যেহেতু, ঐ শব্দ সাবিত্রী ও সোমের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। ¶ উহার অর্থ—প্রজাদিগের পতি বা অধীশ্বর। তবে দশম মণ্ডলের দুইটি ঋক্—

---

* ১৩২৮ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের দ্বাদশ বিশেষ অধিবেশনে পঠিত।

† Vedic Index, Vol. II, p. 77.

‡ ঐ p. 78.

§ "ব্রহ্মা ত্বো বদতি জাতবিদ্যাং
যজ্ঞস্য মাত্রাং বি মিমীত উত্বঃ ॥"
—সায়নাচার্য্য, ঋগ্বেদের উপোদ্ঘাত।

¶ Muir's Sanskrit Texts, *Vol. V*, p. 390.

"আ নঃ প্রজাম্ জনয়তু প্রজাপতিঃ"

"আ সিঞ্চতু প্রজাপতিঃ" †

দেখিয়া বোধ হয়, প্রজাপতি পরে অর্থাৎ দশম মণ্ডলে ভিন্ন দেবতারূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন।

তাঁহার আর এক নাম বিশ্বকর্ম্মা। ঋগ্বেদের পুরাতন মণ্ডলগুলিতে "বিশ্বকর্ম্মা" শব্দ ইন্দ্রের বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হইয়াছিল ‡ কিন্তু দশম মণ্ডলে দেখা যাইতেছে যে, তিনি এক বিভিন্ন এবং নূতন দেবতারূপে বৈদিক দেবমণ্ডলের ভিতর স্থান পাইয়াছেন। দশম মণ্ডলে দেখা যায়, তিনি সর্ব্বদর্শী, তাঁহার চারি দিকে চক্ষু, মুখ, হস্তপদাদি আছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই মণ্ডলের ঋষিগণ বিশ্বকর্ম্মার ডানা পর্য্যন্ত কল্পনা করিয়াছিলেন। স্বর্গ-মর্ত্ত্যাদি নির্ম্মাণ করিবার পর, তিনি হাত ও ডানার সাহায্যে তাহা ঠেলিয়া দিতেন §। তিনিই সর্ব্বজ্ঞানসম্পন্ন, তিনি দেবতাদের নামকরণ করিয়াছেন। তাঁহাকে কোন মনুষ্য কল্পনা করিতে পারে না।

ব্রহ্মার আর এক নাম হিরণ্যগর্ভ। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে এইরূপ বর্ণিত আছে যে, তিনি সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রথম আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনিই স্বর্গ-মর্ত্তের রক্ষাকর্ত্তা। তিনি জীবগণকে প্রাণ ও নিঃশ্বাস প্রশ্বাস দিয়াছেন। তাঁহার আদেশ দেবতারাও অমান্য করেন না। তিনি দেবতাদিগের দেবতা। ¶

ঋগ্বেদে ব্রহ্মা, প্রজাপতি, বিশ্বকর্ম্মা ও হিরণ্যগর্ভ সম্বন্ধে যাহা পাওয়া যায়, বলিলাম। যজুর্ব্বেদের সময় হইতে তাঁহাদের যে একীকরণের চেষ্টা হইতে লাগিল, তাহাই বলিব। প্রজাপতির নাম যজুর্ব্বেদে পাওয়া যায়। তাহাতে দেখা যায়, প্রজাপতি গর্ভে বিচরণ করেন ; তিনি যদিও জন্মান না, তবুও তিনি নানাপ্রকারে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। উঁহার পূর্ব্বে কোন কিছুই জন্মায় নাই। তিনি সর্ব্বজগৎ ব্যাপিয়া বিরাজ করিতেছেন। *

তারপর অথর্ববেদে প্রজাপতি সম্বন্ধে নানা কথা আছে। উক্ত বেদে তাঁহাকে যজুর্ব্বেদের ন্যায় দেবতাদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ স্থান দেওয়া হয় নাই, কিম্বা সৃষ্টির আদিতে রাখা হয় নাই। তবে তিনি যে ভাত (ওদন) হইতে তেত্রিশ লোক নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা বলা

---

* Rig Veda, Vol. X, 85, 43.

† ঐ Vol. X, 169, 4.

‡ Muir's Sanskrit Texts, Vol. V, p. 354.

§ Rig Veda, Vol. X, 81 and 82.

¶ Rig Veda, Vol. X, 121.

* প্রজাপতিশ্চরতি গর্ভে অন্তরজায়মানো বহুধা বিজায়তে।
তস্য যোনিম্ পরিপশ্যন্তি ধীরা তস্মিন্ তস্থুর্ভুবনানি বিশ্বা ॥

—বাজসনেয় সংহিতা—৩১।১৯

হইয়াছে *। কোথাও বা তাঁহাকে প্রাণ বলা হইয়াছে †। তাঁহার জন্ম ব্রহ্মচারী হইতে। যজ্ঞাবশিষ্ট উচ্ছিষ্টই তাঁহার নিবাসস্থল ; কালকর্ত্তৃক তিনি নির্ম্মিত হইয়াছেন ‡।

মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ লইয়া বেদ §। মন্ত্রযুগের কথা সংক্ষেপে বলিলাম। এইবার ব্রাহ্মণযুগের দুই একটি কথা বলিব। তৈত্তিরীয় ও শতপথাদি ব্রাহ্মণেও প্রজাপতির কথা ভূরি ভূরি পাওয়া যায় ¶। প্রজাপতিই সৃষ্টির আদিতে ছিলেন, তিনি মানুষাদি জীবজন্তুর সৃষ্টিকর্ত্তা। পুরুষকে যেহেতু তিনি মন হইতে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই জন্য সমস্ত পশু অপেক্ষা মানব বীর্য্যবত্তম। প্রজাপতিই বাক্ ইত্যাদি।

উপনিষদ্‌গুলিতেও ব্রহ্মা ও প্রজাপতি সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। তাহার মধ্যে অতি সংক্ষেপে দুই একটি কথা বলিব। এই সকলে দেখা যায়, ব্রহ্মা ইতিমধ্যেই একজন বড় দেবতা বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। তিনিই পৃথিবী ও দ্যুলোক নির্ম্মাণ করিয়াছেন—দেবতাদিগের ভিতর তিনিই অগ্রজন্মা। শ্বেতাশ্বতর ও মহানারায়ণোপনিষদে ব্রহ্মাকেই হিরণ্যগর্ভ বলা হইয়াছে ‡। হিরণ্যগর্ভ জল হইতে উদ্ভূত হইয়াছিলেন §। তাঁহাকে ব্রহ্মন্ (নারায়ণ) সর্ব্বাগ্রে জন্ম দিয়াছিলেন। নারায়ণোপনিষদেও দেখা যায়, নারায়ণ হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি হইয়াছে, অতএব ব্রহ্মাই নারায়ণ। ¶ মৈত্রায়ণী উপনিষদে প্রজাপতিকেই হিরণ্যগর্ভ ও বিশ্বস্রষ্টা বলা হইয়াছে। * কৌষীতকীতে আছে, প্রজাপতি পঞ্চমুখবিশিষ্ট †।

## ২। ব্রহ্মার উৎপত্তি

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডল, বাকী নয় মণ্ডল অপেক্ষা নূতন, তাহা প্রত্নতত্ত্ববিৎ সকলেই স্বীকার করেন। ঋগ্বেদের ঋষিরা যে দার্শনিক ও অত্যন্ত চিন্তাশীল ছিলেন, সেরূপ প্রমাণ বড় একটা পাওয়া যায় না। তাঁহারা নৈসর্গিক শোভা, প্রাকৃতিক ব্যাপার দেখিয়া

* "এতস্মাদ্বৈ ওদনাৎ ত্রয়স্ত্রিংশতম্ লোকান্ নিরমিমীত প্রজাপতিঃ।" A. V., XI. 3, 52.

† প্রাণম্ আহুঃ প্রজাপতিম্। A.V., XI. 4, 12.

‡ A. V., XIX. 53, 8, 20

§ "মন্ত্রশ্চ ব্রাহ্মণং চেতি দ্বৌ ভাগৌ।"

—সায়নাচার্য্য, ঋগ্বেদের উপোদ্ঘাত।

¶ E.g., Satapatha Brahmana, VII. 5, 2, 6.

Taittiriya Brahmana, II. 2, 7, 1.

‡ Svetasvatara Upanishad, 4, 12. Mahanarayana Upanishad, 1, 12 ; 24, 2.

§ "অন্ত্যঃ সম্ভূতো হিরণ্যগর্ভঃ"।—Mahanarayan. U. 1, 12.

¶ "নারায়ণাদ্ব্রহ্মা জায়তে"।—Nar. U., I. "ব্রহ্মা চ নারায়ণঃ", I.

* প্রজাপতির্বিশ্বসৃক্ হিরণ্যগর্ভঃ।—Maitra. U., 6, 8.

† Kausitaki U., 2, 4.—"পঞ্চমুখোঽসীতি প্রজাপতিঃ"।

আশ্চর্য্য হইয়া যাইতেন ও বিস্ময়াভিভূত হইতেন এবং প্রাকৃতিক শক্তিপুঞ্জকেই দেবতারূপে কল্পনা করিয়া, তাঁহাদের উদ্দেশে স্তুতিপাঠ করিতেন। এই স্তুতিগুলিই ঋক্ বা সূক্ত বলিয়া পরিচিত। তাঁহারা মেঘ, বজ্র, আকাশ, ভূমি, নদ, নদী, সমুদ্র, এমন কি গাছ-পালাতে পর্য্যন্ত দেবত্বারোপ করিতে ছাড়িতেন না *। ঋগ্বেদের প্রথম নয় মণ্ডলের সূক্তগুলিতে বৈদিক ঋষিদিগের চিন্তাশীলতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। তাঁহারা যখন যে দেবতার গুণগান বা স্তুতি করিতে বসিতেন, তখন তাঁহাকেই দেবতাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান প্রদান করিতেন। ইহাকেই ম্যাক্‌স্‌মূলার "হেনোথীস্‌ম্" বা "কাট্‌হেনো-থীস্‌ম্" নামে অভিহিত করিয়াছেন †। কিন্তু দশম মণ্ডলে দেখা যাইতেছে যে, ঋগ্বেদের ঋষিদের মধ্যে চিন্তার স্রোত প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। ইঁহারা মানবের সৃষ্টি, দেবতার সৃষ্টি, পৃথিবীর সৃষ্টি কি করিয়া হইল, তাহার কারণ স্থির করিতে গিয়া নূতন কাল্পনিক দেবতাদি গড়িতে লাগিলেন। এই সকল দেবতাদিগকে প্রকৃতিতে কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না—ইঁহারা মনের কল্পনা, বহুত্বের একত্ব সন্নিবেশ, মনুষ্যত্বের, দেবত্বের, পৃথিবীর ও জগতের সাকার হইতে নিরাকার কারণ খুঁজিয়া বাহির করিবার দুর্দ্দমনীয় মানব-প্রবৃত্তি। ইহারই ফলে বিশ্বকর্ম্মা, ব্রহ্মন্, স্কম্ভ, ব্রাহ্মণস্পতি, প্রজাপতি, পুরুষ প্রভৃতি দেবতার সৃষ্টি। কিন্তু সকলের আদি কারণ অনেক দেবতা, ইহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না; সেই জন্য প্রজাপতি, বিশ্বকর্ম্মা ইত্যাদি দেবতাদিগের গুণগ্রাম একত্রীকৃত করিয়া বিভিন্নমতে মনোমত বিভিন্ন দেবতা বাছিয়া লইয়া, আদি কারণ নির্ণয় করিতে চেষ্টা হয়। ফলে, উপনিষদে ব্রহ্মন্ (অর্থাৎ পরমাত্মা) সৃষ্টির আদি কারণ হইয়া দাঁড়াইলেন। আমাদের সে সব লইয়া কাজ নাই। এখন ব্রহ্মার কথাই বলি।

ব্রহ্মন্ ঋগ্বেদে ঋত্বিক্-বিশেষ। সেই ব্রহ্মন্ হইতেই ব্রহ্মা, ব্রাহ্মণ ইত্যাদি শব্দের উৎপত্তি। পরে ব্রহ্মন্ হইতেই ব্রহ্মার উৎপত্তি হইল, সে কথা উপনিষদে আছে। ব্রহ্মন্ হইতেই প্রজাপতি হিরণ্যগর্ভ ইত্যাদিরও উৎপত্তি। হিরণ্যগর্ভই প্রজাপতি ও ব্রহ্মা। বিশ্বকর্ম্মার যাহা কাজ—যাহা গুণ, ব্রহ্মারও সেই গুণ—সেই কাজ। অতএব ব্রহ্মা ও বিশ্বকর্ম্মা এক। অন্ততঃ বৈদিক যুগে একই ছিলেন, এ কথা সাহস করিয়া বলা যায়। পরে বিশ্বকর্ম্মা ও ব্রহ্মা ভিন্ন হইয়া যান।

### মনুপ্রোক্ত বিবরণ

মনুসংহিতায় ব্রহ্মার উৎপত্তির বিষয় যাহা বর্ণনা করা আছে, তাহা এই,—

আসীদিদং তমোভূতং অপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ ॥ ‡

* Macdonell, History of Sanskrit Literature, p. 67 ff.

† Ibid, p. 71,

‡ Manu-Sanhita, Chap. 1.

সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎ তমসাচ্ছন্ন, অনির্দ্দেশ্য, অনমুমেয়, বুদ্ধির অগম্য ও প্রসুপ্তসদৃশ ছিল।

ততঃ স্বয়ম্ভূর্ভগবানব্যক্তো ব্যঞ্জয়ন্নিদম্।
মহাভূতাদিবৃত্তৌজাঃ প্রাদুরাসীত্তমোনুদঃ॥ *

পরে স্বয়ম্ভূ ষড়ৈশ্বর্য্যশালী, বাহ্যেন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য, অপ্রতিহতপ্রভাববিশিষ্ট ও প্রকৃতি-প্রবর্ত্তক মহাভূতাদি প্রকাশ করিয়া প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

সোঽভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিসৃক্ষুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ।
অপ এব সসর্জাদৌ তাসু বীজমবাসৃজৎ॥ *

তিনি নানাবিধ প্রজাসৃষ্টিকরণাভিলাষী হইয়া ইচ্ছাশক্তিতে শরীর হইতে প্রথম জল সৃষ্টি করিলেন এবং তাহাতে বীজ নিক্ষেপ করিলেন।

তদণ্ডমভবদ্ধৈমং সহস্রাংশুসমপ্রভম্।
তস্মিন্ জজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা সর্ব্বলোকপিতামহঃ॥ *

সেই বীজ আদিত্যতুল্য প্রভাবিশিষ্ট, সুবর্ণসদৃশ অণ্ডাকারে পরিণত হইলে, সেই অণ্ডে পরমাত্মা স্বয়ং সর্ব্বলোকের পিতামহরূপে জাত হইলেন।

তস্মিন্নণ্ডে স ভগবানুষিত্বা পরিবৎসরম্।
স্বয়মেবাত্মনো ধ্যানাৎ তদণ্ডমকরোদ্দ্বিধা॥ *

এই অণ্ডে এক বৎসর বাস করিবার পর, স্বয়ং ইচ্ছাশক্তির দ্বারা সেই অণ্ড দুই ভাগে ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন।

তাভ্যাং স শকলাভ্যাঞ্চ দিবং ভূমিঞ্চ নির্মমে।
মধ্যে ব্যোম দিশশ্চাষ্টাবপাং স্থানঞ্চ শাশ্বতম্॥

সেই দুই খণ্ডের একটির দ্বারা ভূমি ও একটির দ্বারা স্বর্গ তৈয়ারী করিলেন। মধ্যস্থলে অন্তরীক্ষ, অষ্টদিক্ ও সমুদ্রের স্থান করিলেন।

## ৩। প্রাচীনতম সংস্কৃত-সাহিত্যে ব্রহ্মার রূপ

বৈদিক যুগের এক কৌষীতকী উপনিষদ্ ছাড়া অন্য কিছুতেই খোলাখুলিভাবে ব্রহ্মার রূপ বলা নাই—

"পঞ্চমুখোঽসীতি প্রজাপতিঃ" ‡

কিন্তু একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলে দেখা যায়, তাঁহার রূপের অনেক কথাই বৈদিক যুগেই পাওয়া যায়।

---

* Manu Sanhita, Chapter I.

‡ Kaus, U, 2, 4.

ব্রহ্মৈবৈক ঋত্বিক্ *

"ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্" †

ইহাতে স্পষ্ট তাঁহার ঋত্বিক্‌রূপ পাওয়া যাইতেছে। পরযুগে সেই জন্যই বোধ হয়, তাঁহার হস্তে স্রুক্ ও স্রুব্ দিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ঋগ্বেদী ব্রহ্মন্ ঋত্বিক্‌বিশেষ ছিলেন।

পূর্ব্বে আরও বলা হইয়াছে, বিশ্বকর্ম্মা ব্রহ্মার আর এক রূপ। বিশ্বকর্ম্মার রূপও ঋগ্বেদে বর্ণিত হইয়াছে। তিনি সর্ব্বদর্শী ও নির্ম্মাণদক্ষ ছিলেন। ঋগ্বেদের ঋষিরা যেমন বুঝিয়াছিলেন, তাহাই সরল বিশ্বাসে লিখিয়া গিয়াছেন, আমরা যতই তাহার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিই না কেন! যিনি সর্ব্বদর্শী হইবেন, তিনি মানুষের মত দুই চক্ষু লইয়া কি করিবেন? যতক্ষণ সম্মুখে দেখিবেন, ততক্ষণ পশ্চাতে বা পার্শ্বের কিছুই দেখিতে পাইবেন না। সেই জন্য তাঁহারা বিশ্বকর্ম্মার পশ্চাতে ও পার্শ্বে ও ঊর্দ্ধে আরও মুখ কল্পনা করিয়া গিয়াছেন, সেইরূপ হস্তপদাদি, এমন কি, ডানা পর্য্যন্ত কল্পনা করিয়া গিয়াছেন। আমার বোধ হয়, এই ডানাই প্রজাপতির বাহন হংসরূপে পরে কল্পিত হইয়াছিল। ‡

এই সকল হইতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, বৈদিক যুগেই ব্রহ্মার মূর্ত্তি প্রায় সম্পূর্ণ-ভাবেই গড়িয়া উঠিয়াছিল।

## ৪। ব্রহ্মার পূজা ও তাহার লোপ

বৈদিক যুগে—বিশেষতঃ উপনিষদের সময় ব্রহ্মা ব্রাহ্মণদিগের দেবতামণ্ডলে বেশ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। তখন হইতেই তাঁহার পূজা ও মন্দির গড়া আরম্ভ হয় বলিয়া আমাদের বিবেচনা হয়। অনেক দিন পর্য্যন্ত ব্রহ্মা দেবতাদিগের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া আসিয়াছিলেন। গৃহ্যসূত্রে শ্রৌতসূত্রেও তাঁহার স্থান দেবতাদিগের মধ্যে প্রথম ও প্রধান ছিল। মহাভারতের অপেক্ষাকৃত প্রাচীন অংশাদিতে ব্রহ্মারই আধিপত্য দেখা যায়। §

ঋগ্বেদে যজুর্বেদে শিবের নামগন্ধও নাই। অথর্ববেদে তিনি একজন মস্ত বড় দেবতা। তিনি ব্রাত্যদিগের একমাত্র দেবতা ব্রাহ্মণদিগের দেবমণ্ডলে তিনি অনেক

---

* Chhandogya U., 4. 17 9.

† Bhagavat Gita, 4. 24.

‡ বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো বিশ্বতো বাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ।
সং বাহুভ্যাং ধমতি সং পতত্রৈর্ দ্যাবাভূমি জনয়ন্ দেব একঃ ॥
—Rig Veda, X. 81. 3.

§ *Macdonell, History of Sanskrit Literature, 285*

কষ্টে অর্থাৎ দক্ষযজ্ঞের পর স্থান পান। * বিষ্ণু ঋগ্বেদের প্রধান দেবতা। দেখিতে দেখিতে শিব সকলকে ছাড়াইয়া উঠিবার জো করিলেন। তাঁহাদের তিনজনেরই স্থান প্রায় এক হইয়া দাঁড়াইল। তিন জনের বিভিন্ন কাজ হইল। ব্রহ্মা শুধু সৃষ্টি করিতে লাগিলেন, বিষ্ণু তাহা রক্ষা করিতে লাগিলেন, আর শিব শুধু সংহার করিতে থাকিলেন। ত্রিমূর্ত্তির কল্পনা ও পূজা প্রভৃতি বোধ হয়, এই সময়েই আরম্ভ হয়। মেগাস্থিনিসের পুস্তকে আছে, তিনি যখন চন্দ্রগুপ্ত রাজার রাজধানীতে ছিলেন, তখন দেখিয়াছিলেন, মোটামুটি ভারতবর্ষীয়েরা দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। † যাহারা শিবের উপাসনা করে, তাহারা শৈব ও যাহারা বিষ্ণুভক্ত, তাহারা বৈষ্ণব বলিয়া পরিচিত। শৈবেরা বলে, ত্রিমূর্ত্তির ভিতর শিবই সর্ব্বাপেক্ষা বড় এবং বৈষ্ণবেরা বলে, বিষ্ণুই শ্রেষ্ঠ। সে প্রশ্নের মীমাংসা এখনও হয় নাই; আর কখনও হইবে কি না, সন্দেহ। ব্রহ্মার সম্বন্ধে কেহ কিছুই বলে না। চেলার অভাবে ক্রমশঃ ব্রহ্মার পূজা বন্ধ হইল, মন্দির গড়াও বন্ধ হইল। তিনি নামেই সৃষ্টিকর্ত্তা হইয়া রহিলেন।

মানুষের অবস্থা যেমন সব সময়ে ঠিক থাকে না--কখনও উঠে, কখনও পড়ে, আমাদের দেবতাদিগেরও তাই। কত দেবতা বৈদিক যুগে বড় হইয়াছিলেন, এখন তাঁহাদের নামও শুনা যায় না। কত দেবতার বৈদিক ঋষিরা নামও শুনেন নাই, তাঁহারাই আবার পরবর্ত্তী যুগে অপ্রতিহতক্ষমতাশালী দেবতা হইয়াছেন; কত যে—তাহার আর ইয়ত্তা নাই। শিব নূতন দেবতা, হঠাৎ আসিয়া অতিরিক্ত লোকপ্রিয় হইয়া পড়াতেই ব্রহ্মার অন্ন মারা গেল। তিনি দিন দিন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে লাগিলেন। এখন তাঁহার স্থান আর মন্দিরের মধ্যস্থলে থাকে না—হয় কার্ণিসে, নয় দেওয়ালে, নয় দরজার মাথায়, এইরূপ আনাচে-কানাচেই তিনি বিরাজ করেন।

সূর্য্যের উপাসনা বহু প্রাচীন কাল হইতেই আর্য্যদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল। এমন কি, যখন তাঁহারা ইরানিয়ান্‌দিগের সহিত একসঙ্গে বসবাস করিতেন, তখন হইতেই সূর্য্যের উপাসনা তাঁহাদের মধ্যে চলিয়া আসিতেছিল। সূর্য্যের উপাসনা প্রাচীন ঋষিদিগের মধ্যে বহুলপরিমাণে বিদ্যমান ছিল। সেই সূর্য্যই বিষ্ণুরূপে ঋগ্বেদের ঋষিদের দ্বারা উপাসিত হইতেন। শিবের আগমনে সেই জন্য বিষ্ণুর স্থান বিশেষ পরিবর্ত্তিত হইল না। শিব ব্রাত্যদিগের একমাত্র দেবতা। ব্রাত্যও ভারতবর্ষে বহুলপরিমাণে ছিল, তাহারা শিবকে লইয়া রহিল। কিন্তু ব্রহ্মাকে লইয়া কে থাকিবে? ব্রহ্মার অবস্থা সেরূপ নহে। কোনরূপে ঋগ্বেদের পরবর্ত্তী যুগে তিনি মাথা খাড়া দিয়া উঠিয়াছিলেন—তাঁহার উপাসকও বোধ হয়, সেই জন্য বেশী ছিল না। অথর্ব্ববেদ প্রথম তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ-

* *Asiatic Society of Bengal, Annual Address*, 2nd February 1921. (yet unpublished.)

† Macdonell's History of Sanskrit Literature, p. 286.

স্থান-চ্যুত করিল। তিনি কিছুদিন প্রথম স্থান অধিকার করিবার পরই শিবের অভ্যুদয় হইল। সে অভ্যুদয়ের সম্মুখে দাঁড়াইবার ক্ষমতা কেবল বিষ্ণুর ছিল। তিনি বেশ টিকিয়া রহিলেন। ব্রহ্মার সে ক্ষমতা না থাকায়, তাঁহার পতন হইল। তাহার পর, বৌদ্ধদের আবির্ভাবে তাঁহার উঠিবার আর কোন আশাই রহিল না।

## ৫। পৌরাণিক বিবরণ

ব্রহ্মার পূজা হঠাৎ লোপ হইয়া গেল কেন, ইতিহাসের দিক্ দিয়া তাহার কারণ দিবার চেষ্টা করিয়াছি। পুরাণকারগণও এ বিষয়ে যথেষ্ট চিন্তা করিয়াছিলেন, তাহারই ফলে সাধারণ লোককে বুঝাইবার জন্য "মোহিনীর শাপ", "শিবের শাপ" ইত্যাদি নানা পুরাণে নানা গাল-গল্পের অবতারণা করা হইয়াছিল। তাহারই দুই একটির নমুনা দিই।—

"মোহিনীর শাপ"

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়ে এইরূপ লিখিত আছে যে, মোহিনী নামক জনৈক স্বর্বেশ্যা কামাতুরা হইয়া নির্জ্জনে ব্রহ্মাকে দেখিয়া তাঁহাকে রত্যভিলাষ জ্ঞাপন করেন *।

ইত্যুক্ত্বা মোহিনী সক্তো জগৎস্রষ্টুশ্চ ব্রহ্মণঃ।
বিচকর্ষ করং বস্ত্রং সস্মিতা কামবিহ্বলা ॥ †

ব্রহ্মা, শাস্ত্রীয় যুক্তি ও নীতি অনুসারে মোহিনীকে অশেষপ্রকারে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। মোহিনী কিছুতেই নিরস্ত হইল না। অবশেষে প্রত্যাখ্যাতা হইয়া সে ব্রহ্মাকে তীব্র তিরস্কার করিয়া শাপ দিল,—

তবৈব বচনং স্তোত্রং মন্ত্রং গৃহ্লাতি যো নরঃ।
ভবিতা তস্য বিঘ্নশ্চ স যাস্যত্যুপহাস্যতাম্ ॥
ভবিতা বা ষকী পূজা দেবতানাং যুগে যুগে।
তব মাঘ্যাঞ্চ সংক্রান্ত্যাং ন ভবিষ্যতি সা পুনঃ ॥
কল্পান্তরেঽত্র কল্পে বা দেহে দেহান্তরেঽত্র তে।
পুনঃ পূজা ন ভবিতা যা গতা সা গতৈব চ ॥ ‡

শাপ দিয়া মোহিনী ক্ষিপ্র মদনালয় চলিয়া গেল। অভিসম্পাত ঠিক লাগিয়া গেল। বৃদ্ধ ব্রহ্মার পূজাও লোপ হইয়া গেল।

---

* অতীবনির্জ্জনস্থানে সর্ব্বজন্তুবিবর্জ্জিতে।
সুগন্ধিবায়ুনা রম্যে পুংস্কোকিলরুতশ্রুতে ॥ ৯ ॥
সন্ততং ত্বমনস্কামাং দাসীং জন্মনি জন্মনি।
ক্রীণীহি রতিপণ্যেনামূল্যরত্নেন সত্বরং ॥ ১০ ॥
—শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড, ৩৩ অধ্যায়।

† ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুং—শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড, ৩৩ অধ্যায়—১১ শ্লোক।

‡ ঐ ঐ, শ্লোক ৩৯—৪১।

"শিবের শাপ"

লিঙ্গপুরাণে লিখিত আছে, একদিবস ব্রহ্মা ও বিষ্ণু আপনাদের মধ্যে কে বড়, এই লইয়া খুব তর্কাতর্কি করিতেছেন, এমন সময় শিব আসিয়া উপস্থিত। তিনি বলিলেন, তোমাদের দুই জনের মধ্যে যে আমার এই জ্যোতির্ম্ময় লিঙ্গের আগা কিম্বা শেষ বাহির করিবে, সেই তোমাদের মধ্যে বড় হইবে। এই বলিয়া লিঙ্গ আনয়ন করিয়া, স্বয়ং তাহাতে প্রবেশ করিলেন। শিবের এই মূর্ত্তি লিঙ্গোদ্ভবমূর্ত্তি বলিয়া পরিচিত। * ব্রহ্মা হাঁসের উপর চড়িয়া আগা দেখিতে গেলেন; বিষ্ণু বরাহরূপ ধারণ করিয়া দাঁত দিয়া মাটি খুঁড়িতে খুঁড়িতে নীচে নামিতে লাগিলেন। কত কাল ধরিয়া এইরূপ চলিতে লাগিল। লিঙ্গ অনাদি ও অনন্ত; তাহার আদি অন্ত বাহির করিবে কে? বিষ্ণু দেখিলেন, অসম্ভব। তিনি আসিয়া হাতযোড় করিয়া লিঙ্গোদ্ভবের স্তব করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা অনেক দূরে গিয়া পড়িয়াছেন—বৃথা পরিশ্রমে বিরক্তও খুব হইয়াছেন। কিন্তু সহজে তিনি হারিবার পাত্র নন। মধ্যরাস্তায় দেখিলেন, ভক্তার্পিত একটি কেতকীপুষ্প শিবলিঙ্গের মস্তকচ্যুত হইয়া পড়িতেছে। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিলেন, লিঙ্গের আগা পাওয়া অসম্ভব। কেতকীকে সাক্ষী মানিয়া শিবের নিকট ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, আপনার লিঙ্গের মাথা দেখিয়া আসিয়াছি, এই কেতকী আমার সাক্ষী। শিব সর্ব্বজ্ঞ— তিনি জানেন, তাঁহার লিঙ্গ অনাদি ও অনন্ত —বুঝিলেন, ব্রহ্মা মিথ্যা কথা বলিয়াছেন। তৎক্ষণাৎ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়া, তাঁহার পাঁচ মুখের মধ্যে যে মুখ মিথ্যা উচ্চারণ করিয়াছিল, সেই মাথাটি কাটিয়া ফেলিলেন এবং শাপ দিলেন,—"যেহেতু, তুমি বুদ্ধিহীনতাবশতঃ বালকের ন্যায় আমার কাছে মিথ্যা কথা বলিলে, সেই জন্য অতঃপর মন্দিরে তোমার পূজা আর কেহ করিবে না।"

পুরাণকারেরা ব্রহ্মার পূজা লোপ হইবার এইরূপ কারণ প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

## ৬। ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখ হইলেন কেন?

ব্রহ্মার এতগুলি মুখ কেন হইল, বিশ্বকর্ম্মার কথা বলিবার সময় পূর্ব্বে তাহার কারণ দিবার চেষ্টা করিয়াছি। পুরাণে নানারূপ কারণ দেওয়া আছে। মৎস্যপুরাণে বলে, বেদ তিনি প্রথম আহ্বান করিয়াছিলেন, বেদ চারিটি বলিয়া, তাঁহার মুখ চারিটি †।

এই পুরাণেই আবার দেখা যাইতেছে, পূর্ব্বে ব্রহ্মার একটিমাত্র মুখ ছিল। তিনি সৃষ্টির উদ্দেশে প্রথমে দশ জন মানস ও দশ জন অঙ্গজ প্রজাপতি সৃষ্টি করেন। দশম অঙ্গজ প্রজাপতি তাঁহার কন্যা গায়ত্রী। এই কন্যা সৃষ্টি করিয়া, তিনি তাঁহার

* ছবি—Krishna Sastri—South Indian Images of Gods and Goddesses, fig., 58. এবং Gopinath Rao—Elements of Hindu Iconography, Vol. II, Part I, Plates—XIII, XIV.

† মৎস্যপুরাণম্, ৩ অধ্যায়, শ্লোক—২,৩,৪।

ভুবনমোহিনী রূপ নিরীক্ষণ করিয়া, "অহো রূপম্" "অহো রূপম্" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। কন্যা সে তীব্র কামবিহ্বল দৃষ্টি সহ্য করিতে না পারিয়া সলজ্জভাবে পিতার দৃষ্টি এড়াইবার উদ্দেশে তাঁহার পশ্চাদ্দিকে আসিল। ব্রহ্মার কন্যাকে দেখিবার জন্য দুর্দ্দমনীয় ইচ্ছা থাকায়, পশ্চাদ্দিকে হঠাৎ আর একটি মুখ ফুটিয়া বাহির হইল। কন্যা তখন তাঁহার এক পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলেন, সে দিকে আর একটি মুখ ফুটিয়া বাহির হইল। কন্যা অপর পার্শ্বে আসিলে, সে দিকেও আর একটি মুখ হইল। গায়ত্রী উপায়ান্তর না দেখিয়া আকাশে উড়িতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর আকাশের দিকে মস্তকের মধ্যস্থল হইতে আর একটি মুখ বাহির হইল। এই পাপে ব্রহ্মার সৃষ্ট্যর্থ সঞ্চিত সমস্ত তপঃ বিনষ্ট হইল। ব্রহ্মাও লজ্জিত হইয়া, জটাদ্বারা পঞ্চম মুখটি আবৃত করিয়া ফেলিলেন *। সেই জন্য ব্রহ্মার মুখ চারিটি।

লিঙ্গোদ্ভব শিবের কাছে মিথ্যা বলিবার জন্য কিরূপে তিনি একটি মুখ হারাইয়াছিলেন, লিঙ্গপুরাণোক্ত সে বিবরণ পূর্ব্বেই দিয়াছি।

বামন, মৎস্য, স্কন্দপুরাণাদিতে লিখিত আছে, নারায়ণ সৃষ্টির আদিতে নিদ্রাবসানে পঞ্চবদন ব্রহ্মা ও পঞ্চবদন শিবকে সৃষ্টি করিলেন। উৎপন্ন হইবামাত্র তাঁহারা ভীষণ যোগপ্রভাব বিস্তার করিলেন। নারায়ণ দেখিলেন, এরূপ লোক লইয়া সৃষ্টিকার্য্য অসম্ভব। তখন তিনি অহঙ্কারের সৃষ্টি করিলেন। শিব ও ব্রহ্মা অহঙ্কারের বশীভূত হইয়া কলহ আরম্ভ করিলেন। ব্রহ্মা শিবের প্রতি অপমানসূচক বাক্য প্রয়োগ করিলেন।

"স এবমব্রবীদ্দেব! জন্ম জানামি তে হ্যহম্।"

তাহাতে শঙ্কর ক্রুদ্ধ হইয়া, বামাঙ্গুষ্ঠনখাগ্রদ্বারা ব্রহ্মার একটি মাথা ছিঁড়িয়া লইলেন। † মাথা চারিটি হইয়া গেল। যন্ত্রণায় কাতর ও ক্রুদ্ধ হইয়া ব্রহ্মা শাপ দিলেন,—

যস্মাদনপরাধেন শিরশ্ছিন্নং ত্বয়া মম।
তস্মাচ্ছাপসমাযুক্তঃ কপালী ত্বং ভবিষ্যসি॥

ব্রহ্মার শাপ ফলিয়া গেল। শঙ্কর এই সময়ে কপালী হইলেন। হাতে ব্রহ্মার কাটা মাথা লাগিয়া রহিল। কিছুতেই মড়ার মাথা হাত হইতে খসে না। তাঁহার শরীরে ব্রহ্মহত্যা পাপ প্রবেশ করায়, তাহা ক্ষালন করিবার জন্য তীর্থে তীর্থে ঘুরিয়া বেড়াইলেন, কিন্তু তথাপি নরকপাল হস্ত হইতে স্খলিত হইল না। অবশেষে তিনি নারায়ণের তপস্যা করিতে লাগিলেন। নারায়ণ তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া শিবকে বারাণসীধামে অসি ও বরুণার জলে স্নান করিতে উপদেশ দিলেন। সেখানে স্নান করাতে তিনি ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে

---

* Matsya Purana, Ch. III, Sl. 32—40.

† অতঃ ক্রোধপরীতেন সংরক্তনয়নেন চ।
বামাঙ্গুষ্ঠনখাগ্রেণ ছিন্নং তস্য শিরো ময়া॥
—Matsya P., Adh., 158.

বিমুক্ত হইলেন বটে, কিন্তু তবুও শাপহেতুক নরকপাল তাঁহার হাতে লাগিয়াই রহিল। তৎপরে তিনি ভগবান্ কেশবকে দর্শন করিলেন এবং তাঁহার আদেশমত একটি হ্রদে স্নান করিতেই নরকপাল হাত হইতে খসিয়া পড়িল *। সেই স্থান এখনও "কপালমোচন" তীর্থ বলিয়া বিখ্যাত। †

## ৭। ব্রহ্মার ধ্যান ও মূর্ত্তি

ঋগ্বেদী ও সামবেদী সন্ধ্যার প্রাণায়ামে পূরক করিবার সময় নাভিদেশে ব্রহ্মার ধ্যান করিতে হয়।

হংসস্থং দ্বিভুজং রক্তং সাক্ষসূত্রকমণ্ডলুম্।
চতুর্ম্মুখমহং বন্দে ব্রহ্মাণং নাভিমণ্ডলে ॥

—ঋগ্বেদী সন্ধ্যা।

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে, ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখ, দ্বিভুজ ও হংসবাহন। তাঁহার দুই হস্তের এক হস্তে অক্ষসূত্র ও আর এক হস্তে কমণ্ডলু।

কালিকাপুরাণে যে ধ্যান আছে, তাহাতে তাঁহার মূর্ত্তি সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়,—

ব্রহ্মা কমণ্ডলুধরশ্চতুর্বক্ত্রশ্চতুর্ভুজঃ।
কদাচিৎ রক্তকমলে হংসারূঢ়ঃ কদাচন ॥
বর্ণেন রক্তগৌরাঙ্গঃ প্রাংশুস্তুঙ্গাঙ্গ উন্নতঃ।
কমণ্ডলুর্বামকরে স্রুবো হস্তে তু দক্ষিণে ॥
দক্ষিণাধস্তথা মালা বামাধশ্চ তথা স্রুচঃ।
আজ্যস্থালী বামপার্শ্বে বেদাঃ সর্ব্বেঽগ্রতঃ স্থিতাঃ ॥
সাবিত্রী বামপার্শ্বস্থা দক্ষিণস্থা সরস্বতী।
সর্ব্বে চ ঋষয়ো হ্যগ্রে কুর্য্যাদেভিশ্চ চিন্তনম্ ॥ ‡

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে, তাঁহার চারি মুখ; চারি হাত, দুই দক্ষিণ হস্তের উপরটিতে অক্ষমালা এবং নীচেরটিতে স্রুব্ এবং দুই বামহস্তের উপরটিতে কমণ্ডলু এবং নীচেরটিতে স্রুক্ ধারণ করেন। তিনি কখনও পদ্মাসীন, কখনও বা হংসারূঢ় হইয়া থাকেন। তাঁহার গায়ের রঙ্ রক্তাভ গৌরবর্ণ। বাম পার্শ্বে আজ্যস্থালী ও চারি বেদ তাঁহার সম্মুখে

* E.g. Matsya Purana—Adh. 183, sl. 84—100.

† Matsya Purana, Adh. 183, sl. 101.

"ব্রহ্মহত্যাপহং তীর্থং ক্ষেত্রমেতন্ময়া কৃতম্।
কপালমোচনং দেবি দেবানাং প্রথিতং ভুবি ॥"

‡ Kalika Purana, Adhyaya—82.

অবস্থিত। সাবিত্রী তাঁহার বামে ও সরস্বতী তাঁহার দক্ষিণে এবং সমস্ত ঋষিরা সম্মুখে—এই ভাবে, ব্রহ্মার ধ্যান করিতে হয়।

ব্রহ্মার চারি হাত, চারি মুখ কেন হইল, কেন তাঁহার হাতে স্রুক্ স্রুব দেওয়া হইল, কেনই বা তাঁহার হংস বাহন হইল, তাহার উত্তর পূর্ব্বে দিবার চেষ্টা করিয়াছি। পুরাণে বর্ণিত আছে, নারায়ণ যোগনিদ্রায় নিদ্রিত হইলে, তাঁহার নাভিদেশ হইতে রক্তকমল উত্থিত হয় এবং সেই পদ্মই ব্রহ্মার উৎপত্তি-স্থল। ব্রহ্মা এই পদ্মের উপর বসিয়া সৃষ্টির পূর্ব্বে যোগ করেন। এই জন্য ব্রহ্মার আর একটি নাম "পদ্মযোনি" এবং যোগে বসিয়া আছেন জানাইবার জন্য অক্ষমালাই তাহার জ্ঞাপক। যেহেতু, চারি বেদ তিনি প্রথম স্মরণ করিয়াছিলেন, সেই জন্য তাঁহার সম্মুখে বেদ রক্ষিত হয়। যে কারণে তাঁহার হাতে স্রুক্ ও স্রুব আসিয়াছে, সেই কারণেই কমণ্ডলু ও আজ্যস্থালী তাঁহার পার্শ্বে আসিয়াছে। এই দুইই তাঁহার ঋত্বিক্‌রূপের জ্ঞাপক চিহ্ন।

## ৮। এই ব্রহ্মা কে?

অনেকে মনে করেন, এই ব্রহ্মা অগ্নিরই রূপান্তর মাত্র। তাহার কারণ এই, এখন কদাচিৎ ব্রহ্মার পূজা হয়। গৃহদাহাদি হইলে পুনরায় গৃহনির্ম্মাণ করিবার পূর্ব্বে ব্রহ্মার পূজা করিতে হয়। বারোয়ারীতে, বাজারে আগুন লাগা নিবারণ করিবার জন্য তাঁহার পূজা করিতে হয়। ভিয়ান করিবার পূর্ব্বে হালুইকর ব্রাহ্মণেরা ব্রহ্মার পূজা করিয়া, তবে কার্য্য আরম্ভ করে। উনানে খোলা চড়াইয়া, প্রথম তৈয়ারী জিনিষ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতে হয়। রক্তবর্ণ কৌষেয় বস্ত্র তাঁহার পরম প্রীতিকর। আজ্য, পায়স ও তিলযুক্ত ঘৃতই ব্রহ্মার প্রধান ভোজ্য *। এখন বাঙ্গালায় ব্রহ্মার মাটির মূর্ত্তি গড়া হয়। তাঁহার গায়ের রং টকটকে লাল। পূজা হইয়া গেলে মূর্ত্তি জলে বিসর্জ্জন করিতে হয়।

উপরিউক্ত কারণে পুরাণের ব্রহ্মমূর্ত্তি অগ্নিরই যে মূর্ত্তিভেদ মাত্র বলিয়া এককালে বিবেচিত হইতেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

## ৯। শিল্পশাস্ত্রে ব্রহ্মার মূর্ত্তি

ধ্যান হইতেই শিল্পকারগণ মূর্ত্তি গড়িতেন; এখনও নেপাল, সিকিম্ ও তিব্বতের চিত্রশিল্পীরা ধ্যান কিম্বা সাধনা হইতে মূর্ত্তি গড়িয়া থাকে। শিল্পশাস্ত্র নিয়ম বাঁধিয়া দেয় ও শিল্পীরা তদনুসারে মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। এখন দেখা যাউক, শিল্পশাস্ত্রাদি ও আগম হইতে ব্রহ্মার মূর্ত্তি সম্বন্ধে নূতন খবর কি পাওয়া যায় †।

অংশুমদ্ভেদাগমে ব্রহ্মার রং হরিতালের ন্যায়, কৃষ্ণাজিনের উত্তরীয়; তিনি যজ্ঞোপ-

* বিশ্বকোষ, ত্রয়োদশ ভাগ, পত্র—১৫৪।

† Gopinath Rao—Elements of Hindu Iconography, Appendix, pp., 243,246—49

বীতধারী, শুক্লবস্ত্রপরিহিত, শুক্লমাল্যধর ও তাঁহার কর্ণ কুণ্ডলবিমণ্ডিত। দক্ষিণ হস্তে তাঁহার হয় অক্ষমালা থাকিবে, নহিলে কুশ থাকিবে। বামহস্তদ্বয়ে কুশ ও আজ্যস্থালী ধারণ করিবেন, কিম্বা অভয়মুদ্রা ও বরদমুদ্রা প্রদর্শন করিবেন। সরস্বতী এবং সাবিত্রী হয় বসিয়া থাকিবেন, না হয় দাঁড়াইয়া থাকিবেন, নহিলে পদ্মাসীনা হইবেন।

সুপ্রভেদাগমে নূতনের মধ্যে এই দেখা যাইতেছে, তাঁহার জটা রক্তবর্ণ হইবে। শুধু বামপার্শ্বে সাবিত্রী থাকিবেন এবং তিনি সর্ব্বাভরণে ভূষিতা হইবেন।

শিল্পরত্নে দেখা যায়, তিনি লম্বকুর্চ্চের আসনের উপর আসীন হইবেন। "লম্বকুর্চ্চাসন" আর কিছুই নয়, কুশাসন। তাঁহার রং গৌর হইবে এবং আজ্যস্থালী সম্মুখে থাকিবে। তিনি মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইবেন। তিনি কখনও হংসারূঢ় হইবেন, কখনও বা কমলাসনাসীন হইবেন। আঁকিতে হইলেও এই ব্যবস্থা। বাস্তবেও তাই।

বিষ্ণুপুরাণে দেখা যায়, তিনি কৃষ্ণাজিন-পরিহিত হইবেন এবং সপ্তহংসদ্বারা চালিত রথে সমাসীন হইবেন। হাত তাঁহার দুইটি মাত্র থাকিবে; দক্ষিণে অক্ষমালা এবং বামে কমণ্ডলু থাকিবে। আদিত্যপুরাণে লিখিত আছে, সাবিত্রী তাঁহার বাম উৎসঙ্গে বর্ত্তমান থাকিবেন।

রূপমণ্ডনে নূতনের মধ্যে এই আছে যে, ব্রহ্মা দক্ষিণহস্তদ্বয়ে অক্ষমালা ও স্রুক্ ধারণ করিবেন এবং বামহস্তদ্বয়ে পুস্তক ও কমণ্ডলু ধারণ করিবেন, কিম্বা দক্ষিণহস্তদ্বয়ে অক্ষ-সূত্র ও পুস্তক এবং বামহস্তদ্বয়ে পদ্ম ও কমণ্ডলু ধারণ করিবেন।

এই স্থানে ব্রহ্মাকে "সকূর্চ্চঃ" বা শ্মশ্রুযুক্ত বলা হইয়াছে। ব্রহ্মার দাড়ি ছিল, এ কথা পূর্ব্বে কোথাও বলা হয় নাই। দাড়ির দরকারও খুব। কারণ, তাঁহাকে পুরাণাদি গ্রন্থে "বৃদ্ধ", "প্রপিতামহ" ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত করা হইয়াছে এবং সেই জন্যই বোধ হয়, রূপমণ্ডনে তাঁহাকে প্রথম দাড়ি দেওয়া হইল। কিম্বা অগ্নির দাড়ি আছে বলিয়া, ব্রহ্মাকেও দাড়ি দেওয়া হইয়াছে। কারণ, অগ্নির একটি বিশেষণ "পিঙ্গভ্রূশ্মশ্রুকেশাক্ষঃ"।

## ১০। ব্রহ্মার বিগ্রহাদি—শ্রেণীবিভাগ

পাথরে খোদাই ব্রহ্মার মূর্ত্তি ভারতবর্ষে ও যবদ্বীপে * প্রচুর দেখিতে পাওয়া যায়। সবগুলিই যে শিল্পশাস্ত্র অনুসারে গঠিত হইয়াছে, এমত আমাদের বোধ হয় না। শিল্পশাস্ত্র নিয়ম বাঁধিয়া দিয়াছে, তারপর বিভিন্ন দেশের ও বিভিন্ন সময়ের শিল্পকারগণ তাঁহাদের ইচ্ছামত মোট জিনিষ বজায় রাখিয়া মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছে, আবার ভক্তের ইচ্ছানুসারেও মূর্ত্তি বিভিন্নপ্রকারে গঠিত হইয়াছে।

আমরা কখনও দেখিতেছি, ব্রহ্মা দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, কখনও বসিয়া রহিয়াছেন, কখনও শুধু দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, কখনও পদ্মের উপর বসিয়া রহিয়াছেন—কখনও বা রথের উপর, কখনও বা শুধু হাঁসের উপর। কখনও সাবিত্রী সঙ্গে আছেন, কখনও সরস্বতী

* যবদ্বীপ হইতে আনীত ব্রহ্মার মূর্ত্তি কয়েকটি কলিকাতার নূতন যাদুঘরে রক্ষিত আছে।

—কখনও ঋষিরা কখনও বা সকলেই আছেন। কখনও হাঁস পার্শ্বে রহিয়াছে, কখনও নাই, কখনও দুই পার্শ্বে দুইটি, কখনও বা সাতটা হাঁস। কখনও হাঁস নাই—তাহার বদলে হয় শিবের বাহন নন্দী, নয় বিষ্ণুর বাহন গরুড়, কখনও বা সূর্য্যের বাহন ঘোড়া রহিয়াছে। কখনও হাঁস ও তাহার সহিত নন্দী, গরুড় ও ঘোড়ার মধ্যে একটি রহিয়াছে। কখনও তিনি মন্দিরের গর্ভাগারে বর্ত্তমান, কখনও বা দরজার পার্শ্বে, কখনও বা দরজার উপর, কখনও আনাচে-কানাচেই বর্ত্তমান। কখনও তাঁহার মুখ একটি, কখনও তিনটি, কখনও চারিটি। কখনও একমুখে দাড়ি, কখনও সবকটা মুখে দাড়ি, কখনও বা ছেলে ছোকরা-দের মত দাড়ি একেবারেই নাই। এই যে সকল মূর্ত্তির বিভিন্নতা, ইহার সমস্তটাই ভক্ত ও শিল্পকারের হাতে পূরামাত্রায় নির্ভর করে।

যে সকল মূর্ত্তি সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় এবং শিল্পশাস্ত্রে যে সকল মূর্ত্তির বিবরণ পাওয়া যায়, সে সকল নিম্নলিখিত নয় শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে।

### প্রথম শ্রেণী

ব্রহ্মা দাঁড়াইয়া থাকিবেন। তিনি একক হইবেন। সরস্বতী, সাবিত্রী, হাঁস বা ঋষিরা কেহ উপস্থিত থাকিবেন না। তবে তিনি হয় শুধু দাঁড়াইয়া থাকিবেন, নহিলে পদ্মের উপর দাঁড়াইবেন।

### দ্বিতীয় শ্রেণী

তিনি দাঁড়াইয়া থাকিবেন। এবারে একা নয়—সাবিত্রী বা সরস্বতী বা ঋষিরা বা হাঁস, অথবা ইঁহাদের মধ্যে দুই বা ততোধিক উপস্থিত থাকিবেন।

### তৃতীয় শ্রেণী

তিনি একা বসিয়া থাকিবেন এবং বসিয়া থাকিবেন—পদ্মের উপর। সাবিত্রী ইত্যাদি মায় হাঁস—কেহ উপস্থিত থাকিবেন না।

### চতুর্থ শ্রেণী

তিনি পদ্মাসীন হইবেন। তাঁহার সঙ্গে সাবিত্রী প্রভৃতি পরিবারদেবতাগণের এক দুই বা ততোধিক উপস্থিত থাকিবেন।

### পঞ্চম শ্রেণী

তিনি হাঁসের উপর বসিয়া থাকিবেন। সঙ্গে অন্যান্য পরিবার-দেবতাগণ ও ঋষিরা উপস্থিত থাকিতেও পারেন, নাও থাকিতে পারেন।

### ষষ্ঠ শ্রেণী

তিনি রথে বসিয়া থাকিবেন এবং সেই রথ সাতটি হংস কর্ত্তৃক চালিত হইবে। পরিবার-দেবতারা, বাহন ও ঋষিরা উপস্থিত থাকিতেও পারেন, নাও থাকিতে পারেন। এই মূর্ত্তি অদ্যাবধি পাওয়া যায় নাই।

সপ্তম শ্রেণী

ব্রহ্মার মুখ একটি হইবে, বামে সাবিত্রী থাকিবেন ; হাঁস একেবারেই থাকিবে না। এই মূর্ত্তি প্রজাপতি ব্রহ্মা নামে পরিচিত।

অষ্টম শ্রেণী

তিনি শুধু ঋষিগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইবেন এবং কমলাসনে আসীন হইবেন।

নবম শ্রেণী

তাঁহার সঙ্গে হয় নন্দী থাকিবে, না হয় গরুড় থাকিবে, নহিলে ঘোড়া থাকিবে। হাঁস থাকিতেও পারে, নাও থাকিতে পারে। অন্যান্য পরিবারদেবতাগণ বা ঋষিরা থাকিতেও পারেন ; নাও থাকিতে পারেন। †

## ১১। মূর্ত্তির সময় নিরূপণের উপায়

মূর্ত্তির সময় নিরূপণ করা খুব শক্ত,—অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন যে মূর্ত্তি যত সাদাসিধা হইবে, সে মূর্ত্তি ততই পুরাতন। অবশ্য এ নিয়ম সমস্ত মূর্ত্তি বিষয়ে প্রযোজ্য হইতে পারে না—ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। মূর্ত্তির হাবভাব, গঠনপ্রণালী, ভাস্কর্য্য, কারুকার্য্য, দেখিয়া তাহার উপর যুক্তিতর্ক প্রয়োগ করিয়া তবে সময় নিরূপণ করিতে হয়। ‡

ব্রহ্মার যে মূর্ত্তিতে এক মুখ দুই হাত থাকিবে, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন। যাহাতে চারি মুখ দুই হাত থাকিবে, তাহা নবীনতর। যাহার চারি মুখ দুই হাত থাকিবে, তাহা আরও নূতন। যাহার একমুখে দাড়ি থাকিবে, অন্যমুখে থাকিবে না, তাহা আরও নূতন। যাহার আবার তিন মুখেই দাড়ি, তাহা আরও নূতন। বাস্তবিক খৃষ্টীয় ১০ম ও একাদশ শতাব্দীর পর হইতে ব্রহ্মার যত মূর্ত্তি দেখা যায়, সকলেরই প্রায় সব মুখেই দাড়ি আছে। §  আবার বেশভূষা ও কারুকার্য্য যাহার যত কম সে মূর্ত্তি ততই পুরাতন।

## ১২। ব্রহ্মার মন্দির ও তাহার পূজারী

সচরাচর লোকের বিশ্বাস, পুষ্করের সাবিত্রীপাহাড়ের মন্দির ছাড়া আর কোথাও

---

* Gopinath Rao.—Elements of Hindu Iconography, Vol. II, Part II, p. CXLIV.

† A. S. I., Annual Report, 1906-7, p. 177. fig. 7.

‡ পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় আমার কথাটি বুঝিতে একটু ভুল করিয়াছেন। আমরা জানি, গান্ধার ভাস্কর্য্য খুব পুরাতন। যদি গান্ধারের কোন মূর্ত্তিতে ব্রহ্মার দাড়ি থাকে, শুধু দাড়ি হইতে তাই বলিয়া তাহাকে দশম শতাব্দীতে ফেলা যাইতে পারে না। এই সকল স্থলেই "যুক্তিতর্কের" প্রয়োজন। সময় নিরূপণ করা সম্বন্ধে কোনরূপ বাঁধাধরা নিয়ম করা সকলেরই ক্ষমতাতীত।

§ A. S. I. Annual Report, p. 173.

খাঁটি ব্রহ্মার মন্দির নাই। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। কানিংহাম সাহেব বুন্দেলখণ্ডে দুভাহি নামক গ্রামে অশেষ কারুকার্য্যখচিত একটী মন্দির আবিষ্কার করিয়াছিলেন। * রাজপুতানায় বসন্তগড় নামক স্থানে আর একটী মন্দির পাওয়া গিয়াছে। এই মন্দিরের ব্রহ্মার হাত মাত্র দুইটি। ধারওয়ার জেলায় উন্কল নামক গ্রামে আর একটি মন্দির আছে। † এরূপ খাঁটি ব্রহ্মার মন্দির ভারতবর্ষে যে এখনও অনেক পাওয়া যাইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ধারওয়ার জেলায় যে সকল মন্দিরে ইংরাজ সরকার বাৎসরিক টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন, তাহার মধ্যে অন্ততঃ আটটি খাঁটি ব্রহ্মার। ‡ যতগুলির কথা বলা হইল। ইহা ছাড়া ইদরের ষোল মাইল উত্তরে খেড়্-ব্রহ্ম নামক স্থানে যে মন্দির পাওয়া গিয়াছে, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা বড় ও উত্তম কারুকার্য্যখচিত বলিয়া মনে হয়। §

ব্রহ্মার পূজারী

খেড়্-ব্রহ্মগ্রামে শুক্লবেদাধ্যায়ী উদীচ্য ব্রাহ্মণ কয়েক ঘর বাস করে। তাহারা পুরুষানুক্রমে ব্রহ্মারই পূজা করিয়া আসিতেছে, অন্য কোন দেবতার পূজা করে না। তাহারা কতকাল ধরিয়া যে শুধু ব্রহ্মার পূজা করিয়া আসিতেছে, তাহা কেহই জানে না।

ব্রহ্মার পরিবারদেবতাগণ

রূপমণ্ডনগ্রন্থে ¶ ব্রহ্মার মন্দির গঠন করিবার প্রণালী দেওয়া আছে। মন্দিরের গর্ভাগারে বিশ্বকর্ম্মারূপে ব্রহ্মার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে। তাঁহার চারি মুখ, চারি হাত থাকিবে এবং তাঁহার হাতে অক্ষমালা, বই, কুশগুচ্ছ ও কমণ্ডলু থাকিবে। এবং তিনি হংসারূঢ় হইবেন। আদিশেষ, গণেশ, নবমাতৃকা, ইন্দ্র, জলশয়ী নারায়ণ, পার্ব্বতী এবং রুদ্র, নবগ্রহ ও লক্ষ্মীর মূর্ত্তিসকল পূর্ব্বদিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া থাকিবে। মন্দিরের আটটি দ্বারপালক থাকিবে। তাহাদের নাম সত্য, সধর্ম্ম, প্রিয়োদ্ভব, যজ্ঞ, বিজয়, যজ্ঞভদ্র, সর্ব্বকামিক ও বিভব। ইহা ছাড়া তাঁহার পার্শ্বে, সাবিত্রী, সরস্বতী, মুনিগণ, আজ্যস্থালী ও পুস্তকাদি সমস্তই থাকিবে।

## ১৩। ব্রহ্মার চরিত্র

"দেবতার বেলা লীলাখেলা, পাপ লিখেছে মানুষের বেলা"—মানুষ যাহা করিলে পাপী হয়, ব্রহ্মা সেইরূপ কতকগুলি দোষ করিয়াছিলেন। শিবের সম্মুখে মিথ্যা কথা বলায় তাঁহার মাথা কাটা পড়িয়াছিল। আর একবার শিবের সহিত ঝগড়া করিবার সময় প্রাকৃত জনের ন্যায় অপমানসূচক বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি আত্মজ

* Cunningham. A. S. R., Vol. X, p. 93.
† A. S. I., Annual Report, 1906-7, p. 175.
‡ Ibid.
§ See "Temple of Brahma at Khed Brahama" in A. S. I., Annual Report 1906-7, p. 171 ff.
¶ Gopinatha Rao—Elements of Hindu Iconography, Vol. II, Part II, App., pp. 246-47.

কন্যা গায়ত্রীর প্রতি কামাসক্ত হইয়াছিলেন। শিবের সহিত তাঁহার শত্রুতা ছিল, কিন্তু শিবের তিনি বিশেষ কোন ক্ষতিই করিতে পারেন নাই। তবে তাঁহাকে একবার শাপ দিয়া কপালী করিয়াছিলেন। শিব ত্রিপুরাসুরদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিবার সময় ব্রহ্মাকে সারথি করিয়াছিলেন। দক্ষযজ্ঞের সময় ব্রহ্মা পুরোহিতের কার্য্য করিয়াছিলেন এবং তাহা বোধ হয়, শিবের প্রতি জাতক্রোধবশতঃই করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মার চরিত্রের ভাল গুণও দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি ধর্ম্মভীরু ছিলেন। মোহিনীকে সৎপথে আনিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন ও শেষে তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। শিবের বিবাহে, এমন কি, কার্ত্তিকেয়ের বিবাহেও তিনি পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন। তিনি দেবতাদিগের ভরসাস্থল ছিলেন। যখনই কোন গোলমাল হইত, তখনই ব্রহ্মাকে মধ্যস্থ হইতে হইত। তিনি যখন মিটাইতে পারিতেন না, তখন শিব কিম্বা বিষ্ণুর নিকট উপস্থিত হইয়া পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। তিনি দেবতাদিগের "ছাই ফেলিতে ভাঙ্গা কুলো" গোছের ছিলেন। যখনই মর্ত্তের কোন লোক ভীষণ তপস্যা করিয়া দেবতাদের মনে ত্রাস জন্মাইয়া দিত, তখনই ব্রহ্মাকে বর দিতে ছুটিতে হইত।

শ্রীবিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য

---

# 'ব্রহ্মা' প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা

( ১ )

প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় ব্রহ্মার উৎপত্তি, পূজা প্রভৃতি সম্বন্ধে বহু তথ্যের একত্র সমাবেশ করিয়া আমাদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন; তাঁহার অধ্যবসায় প্রশংসার্হ; তিনি বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া পুরাণ-যুগ পর্য্যন্ত, এমন কি, তৎপরবর্ত্তী সময়েরও শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া ব্রহ্মা সম্বন্ধে একটি ধারাবাহিক, সুসংলগ্ন গবেষণার পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন; এই হিসাবে আমি সাহিত্য-পরিষদের ইতিহাস-শাখার পক্ষ হইতে তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

বৈদিক যুগে ব্রহ্মা দেবতা ছিলেন কি না?

বৈদিক যুগে যে ব্রহ্মা দেবতা-স্বরূপ গণ্য হইতেন না, এ কথা আমি ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম না। আমাদিগকে সন্ধ্যাহ্নিক করিবার সময় নিম্নলিখিত মন্ত্রটী উচ্চারণ করিতে হয়,—"প্রজাপতি-ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো ব্রহ্মবায়ুগ্নিসূর্য্যাশ্চতস্রো দেবতাঃ প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ"।—এই মন্ত্রে ব্রহ্মাকে চারিজন দেবতার অন্যতম হিসাবে বর্ণনা করা হইয়াছে।

বৈদিক যুগে ব্রহ্মা যে ঋত্বিক্-হিসাবেও গণ্য হইতেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। অনেকের মনে সন্দেহ হইতে পারে, এই আশঙ্কায় বলিয়া রাখি যে, ঋত্বিক্ হইলে দেবতা হইতে কোন বাধা যে থাকিবে, এরূপ আশঙ্কার কোন ভিত্তি নাই। ঋগ্বেদ-সংহিতায় অগ্নি একজন সুপ্রসিদ্ধ দেবতা বলিয়া খ্যাত হইলেও, ঋত্বিক্ বলিয়া ইঁহার বিশেষ খ্যাতি কাহারও অবিদিত নহে। অগ্নিকে পুরোহিত, দেবতা, ঋত্বিক্ প্রভৃতি বহু নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের প্রথম সূক্তেই অগ্নিকে পুরোহিত, ঋত্বিক্ প্রভৃতি বিশেষণে আহ্বান করা হইয়াছে, এবং তৎসঙ্গে অগ্নির স্তুতিও করা হইয়াছে। এই সূক্তের অগ্নি দেবতা। সেই কল্প বেদের ব্রহ্মা ঋত্বিক্‌ও ছিলেন, দেবতাও ছিলেন।

ব্রহ্মা ঋত্বিক্‌ও ছিলেন।

ব্রহ্মা অনেক মন্ত্রের ঋষি ছিলেন। আমরা সন্ধ্যাহ্নিক করিবার সময় নিম্নলিখিত মন্ত্রগুলি পাঠ করি,—"ওঁকারস্য ব্রহ্মঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোঽগ্নির্দেবতা সর্ব্বকর্ম্মারম্ভে বিনিয়োগঃ"। সন্ধ্যোক্ত প্রাতরাচমন-মন্ত্রেও আছে,—"সূর্য্যশ্চ মেতি মন্ত্রস্য ব্রহ্মঋষিঃ প্রকৃতিশ্ছন্দ আপো দেবতা আচমনে বিনিয়োগঃ।"

ব্রহ্মা মন্ত্রের ঋষিও ছিলেন।

এ স্থলে একটি কথার উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি। প্রবন্ধলেখক দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, ব্রহ্মন্ অর্থে সর্ব্বপ্রথমে ঋত্বিক্ বুঝাইত, এবং ক্রমে ক্রমে ইঁহাতে দেবত্বের আরোপ হইয়াছে; কিন্তু যাস্ক দেবগণের কথা বলিতে গিয়া, প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মা এক শ্রেণীর হোতা বা পুরোহিত। নিরুক্ত হইতে নিম্নলিখিত বচনটি উদ্ধৃত করিতেছি,—"অপি বা কর্ম্মপৃথক্‌ত্বাৎ যথা—হোতাঽধ্বর্য্যুঃ ব্রহ্মা উদ্গাতা ইত্যপি একস্য-শতাঃ" ইত্যাদি। যাস্ক খ্রীষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। তাঁহার সময় ব্রহ্মা অর্থে এক শ্রেণীর পুরোহিত বুঝাইত; কিন্তু ইহাও আমাদের জানা আছে যে, এই সময়ের বহুপূর্ব্বে তিনি দেবতাশ্রেণীভুক্ত ছিলেন। সুতরাং আমি এইরূপ অনুমান করিতেছি যে, বহু প্রাচীন কাল হইতে খ্রীষ্টাব্দের কিছু পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ব্রহ্মা অর্থে ঋত্বিক্ বুঝাইত, এবং প্রাচীন কালে ইহাতে একাধারে দেবতা, ঋষি ও ঋত্বিক্ বুঝাইত। বহু পরে বেদাচার্য্য সায়নও যে সাত জন হোতার উল্লেখ করিয়াছেন, ব্রহ্মা তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার কর্ত্তব্য ছিল, যজ্ঞ সম্বন্ধীয় সমুদয় বিষয়ের তত্ত্বাবধান করা। কোন কোন স্থলে ব্রহ্মাকে অথর্ব্ববেদান্তর্গত পুরোহিতদিগের অন্যতম হিসাবে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। আর একটি কথা বলিয়া রাখি; ঋক্, উক্‌থ, স্তোম, অর্ক, বাচ্ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে বেদমন্ত্রগুলি কথিত হইত। এই সকল বিভিন্ন নামের মধ্যে ব্রহ্ম নাম দৃষ্ট হয়। ব্রহ্ম তাহা হইলে দাঁড়াইল—বেদমন্ত্র-বিশেষ। ইহা হইতে নিরুক্ত-কথিত ব্রহ্মা শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে।

নিরুক্তের মতে ব্রহ্মা হোতৃগণের একজন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, ব্রহ্মার বর্ণনায় ঋষিত্ব, ঋত্বিকৃত্ব ও দেবত্ব, এই ত্রিভাবই বর্ত্তমান। এই ত্রিভাব পৌরাণিক যুগেও বলবান্ দেখা যায়; এবং তাহা হইতে শিল্পেও পৌঁছিয়াছে। ব্রহ্মার ধ্যান ও প্রণাম-সময়ে যে স্তোত্রটি উচ্চারিত হয়, তাহাতে তাঁহাকে এই তিন ভাবেই দেখা হইয়াছে। ঋত্বিকের চিহ্ন-স্বরূপ তাঁহার হস্তে স্রুক্ স্রুব রহিয়াছে; উক্ত হয়—"স্রুক্-স্রুবহস্তায় তে নমঃ।"

ব্রহ্মা—ঋষি, ঋত্বিক্ ও দেবতা, এই তিনই।

ব্রহ্মা ঋষিদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ না হইলে, ওঁকার মন্ত্রের ঋষি বা রচয়িতা বলিয়া কথিত হইতেন না। বহুপরবর্ত্তী যুগের পুরাণেও তাঁহাকে বেদাধার, বেদ্য, জ্ঞানগম্য ও সূরি প্রভৃতি সংজ্ঞায় অভিহিত করা হইয়াছে—"বেদাধারায় বেদ্যায় জ্ঞানগম্যায় সূরয়ে"। তাঁহার ধ্যানে তাঁহাকে পুস্তকযুক্ত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। শিল্পেও জ্ঞান-পিতামহ ব্রহ্মার হস্তে পুস্তক রাখা হইয়াছে।

ব্রহ্মজ্ঞানের আকর ও আধার।

ব্রহ্মা সর্ব্বজ্ঞানের আকর বলিয়াছি; তিনি জ্যোতিষশাস্ত্রেরও একজন প্রবর্ত্তক। যে আঠার জন ঋষি জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রবর্ত্তক, ব্রহ্মা তাঁহাদের অন্যতম। ব্রহ্মা ঋষি যে জ্যোতিষ-শাস্ত্র প্রণয়ন করেন, তাহার নাম ব্রহ্মসিদ্ধান্ত; ইহা পঞ্চসিদ্ধান্তিকার অন্তর্গত।

ব্রহ্মা জ্যোতিষের একজন প্রবর্ত্তক।

পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মসিদ্ধান্তের মতে দিনমানের পরমবৃদ্ধি ৩৬ দণ্ড ও পরমহ্রাস ২৪ দণ্ড। লগধ ঋষি-প্রণীত বেদাঙ্গ-জ্যোতিষেও এই বচনের উল্লেখ আছে। গণনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ৩৪°৪৮ অক্ষাংশযুক্ত দেশে ঐ ব্রহ্মসিদ্ধান্তোক্ত বচন প্রযোজ্য। তিব্বত, কাশ্মীর, পারস্য, আসিরিয়া প্রভৃতি প্রদেশ এই অক্ষাংশে অবস্থিত। কাশ্মীর-রাজ্যের রাজধানী শ্রীনগরের কিছু উত্তর দিয়া ইহা গিয়াছে। এখন ঐতিহাসিকেরা বিচার করিয়া দেখুন যে, ঐ সকল প্রদেশের কোথায় ব্রহ্মার বাসস্থান কল্পিত হইতে পারে।

জ্যোতিষশাস্ত্র হইতে ব্রহ্মা ঋষির বাসস্থান নির্ণয়।

উপনিষৎ বা পুরাণোক্ত ব্রহ্মার বাসস্থান নির্ণয় বুঝিতে হইলে, এতদুক্ত ভৌগোলিক পরিচয় থাকা কর্ত্তব্য। দেবতাদের বাসস্থান মেরু পর্ব্বতের উত্তরে ও দক্ষিণে তিনটি করিয়া বর্ষ বা দেশ; মেরুর নাম, ইলাবৃত বর্ষ। এ মেরু জ্যোতিষের সুমেরু নহে; ইহা তাহা হইতে একেবারে স্বতন্ত্র। সর্ব্বদক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া এবং মেরু বা ইলাবৃতবর্ষকে লইয়া সাতটি বর্ষের উল্লেখ করা যাইতেছে—ভারতবর্ষ, কিম্পুরবর্ষ, হরিবর্ষ, ইলাবৃতবর্ষ, কুরুবর্ষ, হিরণ্ময়বর্ষ ও রম্যকবর্ষ। ইহাদের পঞ্চম, অর্থাৎ কুরুবর্ষেই ব্রহ্মার বাস নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে উল্লেখ আছে যে, পঞ্চম অমৃতে বা কুরুবর্ষে ব্রহ্মার বসতি—"অথ যৎ পঞ্চমমমৃতং তৎ সাধ্যা উপজীবন্তি ব্রহ্মণা মুখেন।" উপনিষদুক্ত কুরুবর্ষ আমার বোধ হয়, মধ্য-এসিয়া বা তাহার কিঞ্চিৎ উত্তরস্থ সাইবিরিয়া প্রদেশের নিকটে

ব্রহ্মার বাসস্থান সম্বন্ধে উপনিষৎ ও পুরাণের মত।

অবস্থিত ছিল। কিন্তু রামায়ণ বা পুরাণোক্ত বর্ণনা হইতে বোধ হয় যে, কুরুবর্ষ উপনিষদুক্ত সংস্থানের বহু উত্তরে গিয়া পৌঁছিয়াছে। রামায়ণে উল্লেখ আছে যে, কুরুবর্ষে ব্রহ্মার বসতি, এবং সেখানে সূর্য্য নয়নগোচর হয় না, এবং ইহার উত্তর প্রদেশে যাওয়া যায় না। এই বর্ণনা হইতে বোধ হয় যে, রামায়ণের সময় কুরুবর্ষ সুমেরুর দক্ষিণে অবস্থিত ছিল। এখানে ছয় মাস রাত্রি ও ছয় মাস দিন। রামায়ণ-রচয়িতা কুরুবর্ষের যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা বৎসরের যে সময় ছয় মাস রাত্রি, সেই সময়েই প্রযোজ্য। পুরাণোক্ত বর্ণনাও রামায়ণের অনুযায়ী।

ব্রহ্মার সহিত অন্য দেশের প্রাচীন দেবতার সাদৃশ্য।

অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, আমাদের ব্রহ্মার সহিত অন্যদেশীয় কোন প্রাচীন দেবতার সাদৃশ্য আছে কি না। প্রাচীন মিসর দেশের দেবতাগণ সম্বন্ধে যৎসামান্য আলোচনা করিয়া বুঝিয়াছি যে, ব্রহ্মার অনুযায়ী কোন দেবতাই এ দেশে ছিল না। তবে মিসরবাসীদিগের সবিতৃ-দেবতা "রে" (Re)র অনেকগুলি লক্ষণ ব্রহ্মাতে প্রযোজ্য হইতে পারে। Aegypten-প্রণেতা পণ্ডিত আর্ম্যান্ (Herr Erman) দেখাইয়াছেন যে, স্থাবর, জঙ্গম, দেবতা প্রভৃতি সমস্তই "রে"র শরীর হইতে সৃষ্ট হইয়াছিল, এবং তাঁহার কন্যা আইসিস্ (Isis) জ্ঞানে সমস্ত দেবদেবী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠা ছিলেন। আইসিস্ অনেকটা আমাদের সরস্বতীর ন্যায়; "রে"কে ব্রহ্মার ন্যায় কন্যার প্রতি আসক্ত হইতে শুনা যায় নাই। মনুসংহিতায় ব্রহ্মার উৎপত্তি-বিষয়ে কথিত আছে যে, সৃষ্টির পূর্ব্বে স্বয়ম্ভূ ভগবান্ ইচ্ছাশক্তি দ্বারা জল সৃষ্টি করিয়া, তাহাতে বীজ নিক্ষেপ করেন, কালক্রমে বীজ অণ্ডে পরিণত হইলে, তাহাতে পিতামহ ব্রহ্মা জন্মপরিগ্রহ করিলেন। স্থূলতঃ ব্রহ্মা মহাসমুদ্র বা জল হইতে জাত হইয়াছেন, ইহা স্বীকার করিয়া লওয়া যাইতে পারে। প্রাচীন মিসরবাসিদিগের দেবতা "রে"ও নান্ নামক দেবতাধিষ্ঠিত মহাসমুদ্র হইতে উদ্ভূত হইয়াছিলেন। এ স্থলে বলিয়া রাখা উচিত যে, "রে" ও ব্রহ্মার লক্ষণ প্রভৃতি সম্বন্ধে যথেষ্ট বৈসাদৃশ্য লক্ষিত হয়। এক্ষণে গ্রীক্‌দিগের কোন দেবতার সহিত ব্রহ্মার সাদৃশ্য আছে কি না, দেখা যাউক। প্রবন্ধকার বলিয়াছেন যে, অন্ততঃ বৈদিক যুগে ব্রহ্মা ও বিশ্বকর্ম্মা একই ছিলেন। হেমাদ্রিও ব্রহ্মার যে চারিটি শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন, বিশ্বকর্ম্মা তাহার অন্তর্গত। তাঁহার শ্রেণীবিভাগ এই—প্রজাপতি, বিশ্বকর্ম্মা, লোকপাল এবং ধর্ম্ম। গ্রীক্‌দিগের বিশ্বকর্ম্মা Hephaistos (হিফেষ্টস্)। এই হিফেষ্টস্, আমার বিশ্বাস, অগ্নিদেবতা বা ল্যাটিনদিগের ভল্‌ক্যান (Vulcan)। কক্স্ (Cox) তাঁহার Mythology of the Aryan Nations পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, হিফেষ্টস্ ও বৈদিক যবিষ্ঠ বা অগ্নির সহিত বিশেষ সম্বন্ধ আছে। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ১২ সূক্ত, ষষ্ঠ ঋকে অগ্নিকে যুবা বলা হইয়াছে। পুনশ্চ এথেন্স নগরে হিফেষ্টিয়া নামে যে উৎসব হইত, তাহা অগ্নির উৎসব এবং ইহাতে প্রজ্বলিত মশাল লইয়া দৌড়াইতে হইত। আমার যত দূর গ্রীক্-দেবতত্ত্ব পাঠ করা আছে, তাহাতে

ব্রহ্মার অনুযায়ী দেবতা প্রাচীন গ্রীসদেশে ছিল না বলিয়া বিশ্বাস। তাহা হইলে ব্রহ্মা ও বৈদিক বিশ্বকর্ম্মা এক হইলেও, গ্রীক্ বিশ্বকর্ম্মা বা হিফেষ্টস্ নহেন, বুঝা গেল। অনেকে মনে করেন যে, আমাদের সরস্বতীর সহিত ল্যাটিনদিগের মিনার্ভার সাদৃশ্য আছে। ব্রহ্মার শরীর হইতে যেমন সরস্বতীর উদ্ভব হইয়াছিল, তেমনি জুপিটারের মস্তিষ্ক হইতে মিনার্ভার জন্ম হইয়াছিল। উভয়েই জ্ঞান ও ললিতকলার অধিষ্ঠাত্রী দেবী; কিন্তু মিনার্ভা যুদ্ধেরও অধিষ্ঠাত্রী। পদ্মপুরাণে সরস্বতীর যে ধ্যান আছে, তাহাতে যুদ্ধের অধিষ্ঠাত্রী হওয়ার কথা নাই; তবে তিনি "বরদা" এবং "বন্দিতাম্বরদানবৈঃ"। মহীশূরের অন্তর্গত বেলুড় ও হালেবিড্ গ্রামস্থ হৈসল নরপতিদিগের মন্দিরগাত্রে সরস্বতীর মূর্ত্তির হস্তে অঙ্কুশ ও পাশ দেখিয়াছি; এই দুইটিকে যুদ্ধের প্রহরণ মনে করা যাইতে পারে।

বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয় ও ব্রহ্মার সাদৃশ্য।

এই উপলক্ষে বলিয়া রাখা উচিত মনে করি যে, উত্তর-বর্ণিয়োর বৌদ্ধেরা বোধিসত্ত্ব কল্পনায় ব্রহ্মার নিকট বিশেষভাবে ঋণী। বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয় ও ব্রহ্মার মধ্যে বিশেষ সাদৃশ্য আছে।

প্রবন্ধলেখক ব্রহ্মা সম্বন্ধে যথেষ্ট পৌরাণিক বিবরণ দিয়াছেন; আমি সে সম্বন্ধে কিছুই বলিতে ইচ্ছা করি না। ব্রহ্মার মূর্ত্তি ও মন্দির সম্বন্ধে প্রবন্ধলেখক যাহা বলিয়াছেন, তাহা বিশদ করিবার চেষ্টা করিব, এবং যাহা বলেন নাই, তাহাও বলিব।

শিবের প্রাধান্যে ব্রহ্মার পূজা লোপ।

প্রবন্ধলেখক বলিয়াছেন যে, নূতন দেবতা "শিব হঠাৎ আসিয়া অতিরিক্ত লোকপ্রিয় হইয়া পড়াতেই ব্রহ্মার অন্ন মারা গেল"—অর্থাৎ ব্রহ্মার পূজার লোপ হইল। ইহার তিনি কোন ঐতিহাসিক বা শাস্ত্রীয় প্রমাণ দেন নাই, প্রমাণাভাবে ইহা অবশ্যই অগ্রাহ্য। শিবের প্রাধান্যের জন্য "তাঁহার (অর্থাৎ ব্রহ্মার) স্থান আর মন্দিরের মধ্যস্থলে থাকে না, হয় কার্ণিসে, নয় দেওয়ালে, নয় দরজার মাথায়—এইরূপ আনাচে-কানাচেই তিনি বিরাজ করেন।" ইহাও পূর্ব্বের ন্যায় অগ্রাহ্য। আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করি যে, তিনি কোথায় ব্রহ্মার মূর্ত্তি মন্দিরের কার্ণিসে দেখিয়াছেন?

ঋগ্বেদে ব্রহ্মার তেমন বহুল উল্লেখ নাই, কিন্তু অগ্নির যথেষ্ট উল্লেখ আছে। ব্রহ্মার তেমন লোকপ্রিয়তা বা প্রচার কোন কালেই ছিল না বলিয়া বোধ হয়। এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, যাহাতে মনে হইতে পারে যে, কোন কালে ব্রহ্মার বহু মন্দির ও মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছিল, এবং ক্রমশঃ তাহার লোপ হইয়াছে। ব্রহ্মা ত দূরের কথা, যে সকল দেবতা বৈদিক যুগে বিশেষভাবে স্তুত হইতেন, অর্থাৎ যেমন—অগ্নি, ইন্দ্র, বরুণ,—তাঁহাদেরই মূর্ত্তি তেমন দেখা যায় না। অগ্নি এখন মন্দিরের পার্শ্বদেবতা-স্বরূপ হইয়াছেন। ব্রহ্মার মূর্ত্তি কচিৎ দৃষ্ট হয়; তাহা বলিয়া ইঁহার পূজা বা স্তব-স্তুতির লোপ হয় নাই।

এখনও ব্রাহ্মণ দৈনিক সন্ধ্যা-বন্দনার সময় ব্রহ্মার ধ্যান করিয়া থাকেন। এমন কি, বাস্তু-পূজার সময়ও ব্রহ্মার পূজা হইয়া থাকে স্মার্ত্ত রঘুনন্দন 'মঠপ্রতিষ্ঠাদিতত্ত্বম্' গ্রন্থে এ সম্বন্ধে প্রাচীন হয়শীর্ষ হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন দেখিয়াছি। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, প্রাচীন কাল হইতে ব্রহ্মাপূজার একটা পারম্পর্য্য রক্ষিত হইয়া আসিতেছে।

ব্রহ্মার মূর্ত্তি ও মন্দির।

সাহিত্য, ইতিহাস, পুরাণ হিসাবে ব্রহ্মার বহুল প্রচার থাকিলেও, শিল্প হিসাবে ইঁহার তেমন প্রতিপত্তি দেখা যায় না। ভারতের যেখানে সেখানে বিষ্ণু, শিব, দুর্গা বা গণেশের বহু প্রকার মূর্ত্তি মিলিবে, কিন্তু ব্রহ্মার মূর্ত্তি নিতান্ত বিরল। ভারতের কয়েকটি স্থান ভিন্ন ইঁহার মন্দিরও তেমন দৃষ্ট হয় না। প্রবন্ধলেখক মহাশয় Archaeological Survey of India হইতে অনেকগুলি মন্দিরের সন্ধান দিয়াছেন; কিন্তু আমাদের দেশের নিকটে যে একটি মন্দির রহিয়াছে, তাহার সংবাদ দেন নাই। সহস্রে একজনও এই মন্দিরের সংবাদ রাখেন না। আমিও

ভুবনেশ্বরস্থ ব্রহ্মার মন্দির।

রাখিতাম না। মন্দিরটি সামান্য বলিয়া সকলেই ইহাকে উপেক্ষার চক্ষে দেখেন ও এই জন্য ইহার বিষয় অবগত নহেন। মন্দিরটি ভুবনেশ্বরস্থ বিন্দুসরোবরের পূর্ব্বপার্শ্বস্থ ঘাটের ধারে অবস্থিত। দক্ষিণমুখী ব্রহ্মার মূর্ত্তিটি চতুর্হস্ত, চতুর্মুখ এবং পদ্মোপরি দণ্ডায়মান; ইঁহার বাহন হংস। দক্ষিণপার্শ্বস্থ উপরকার ও নিম্নহস্তে যথাক্রমে পুস্তক ও জপমালা রহিয়াছে, এবং বামদিকের উপরকার ও নিম্নহস্তে যথাক্রমে স্রুক্ ও গাড়ুর আকারের কমণ্ডলু বর্ত্তমা ব্রহ্মার উভয় পার্শ্বে দুইটি দ্বারপাল রহিয়াছে।

ব্রহ্মার মন্দিরের পার্শ্বদেবতা।

এই মন্দিরের পার্শ্বদেবতাগুলি উল্লেখযোগ্য। পিছনের দেওয়ালের বহির্দেশে অর্থাৎ উত্তর দিক্‌স্থ ভিত্তিগাত্রে একমুখ ব্রহ্মার মূর্ত্তি ক্ষোদিত, পশ্চিম দিকের দেওয়ালে দেবর্ষি নারদের মূর্ত্তি রহিয়াছে, এবং পূর্ব্বদিকের ভিত্তিগাত্রে পার্ব্বতীমূর্ত্তি বর্ত্তমান।

একমুখ ব্রহ্মা।

পিছনের ভিত্তিগাত্রে যে একমুখ ব্রহ্মার মূর্ত্তি ক্ষোদিত রহিয়াছে বলিলাম, তিনি পদ্মোপরি দণ্ডায়মান; তাঁহার দুই হাত, এবং মুখ শ্মশ্রুযুক্ত; দক্ষিণ হস্তে জপমালা রহিয়াছে এবং বাম হস্তটি ভগ্ন।

ব্রহ্মার মূর্ত্তির পরিমাণ।

মন্দির-মধ্যস্থ চতুর্মুখ ব্রহ্মামূর্ত্তির অঙ্গের মাপগুলি আমি গজকাঠির দ্বারা মাপিয়া লইয়াছিলাম; যদি ইহা জানিবার জন্য কাহারও কৌতূহল হইয়া থাকে, তজ্জন্য তাহা নিম্নে দেওয়া গেল:—

| | |
|---|---|
| মস্তকশীর্ষ হইতে পাদদেশ ... ... | ৩´—৩´´ |
| মস্তক ... ... ... | ৬´´ |
| স্কন্ধদ্বয়ের ব্যবধান ... ... | ১´–২´´ |
| স্তনান্তর ... ... | ৫´´ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| স্তন ও নাভির ব্যবধান | ... | ... | ৫½″ |
| নাভি হইতে পাদদেশ | ... | ... | ১′—১০½″ |
| পাদদেশ হইতে জানুদেশের মধ্য | ... | ... | ०′—১০″ |
| পদ-দৈর্ঘ্য | ... | ... | ०′—৭¾″ |
| পদ-প্রস্থ | ... | ... | ०′—৩″ |

এই পরিমাণ হইতে অনেক কথার অবতারণা করা যাইতে পারে; বাহুল্যভয়ে তাহা হইতে বিরত হইলাম।

মূর্ত্তির ধ্যান ও সাধনা।

প্রবন্ধলেখক বলিয়াছেন, "ধ্যান হইতেই শিল্পকারগণ মূর্ত্তি গড়িতেন।...... শিল্প-শাস্ত্র নিয়ম বাঁধিয়া দেয় ও শিল্পীরা তদনুসারে মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া থাকে।" আমার বোধ হয়, শিল্পীরা মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিবার সময় ধ্যান ও সাধনার বিশেষ ধারই ধারিতেন না। ভুবনেশ্বরের যে ব্রহ্মামূর্ত্তির কথা বলিয়াছি, তাহার সহিত প্রবন্ধোক্ত কোনও শিল্পশাস্ত্রের বর্ণনার সাদৃশ্য নাই। শতকরা ৯৯টি মূর্ত্তিতেই দেখা যায় যে, ইহার বৈচিত্র্য ধ্যান ও সাধনা হইতে বিভিন্ন ধরণের। তবে মোটামুটি যাহা সাধারণে বিশ্বাস করে, শিল্পকারেরা তাহাই রক্ষা করিতেন। প্রবন্ধলেখক ব্রহ্মার বিগ্রহের শ্রেণীবিভাগ বর্ণনা করিবার সময় নিজেই এই কথা বলিয়াছেন; উহাতে একটু অসঙ্গতি রহিয়া গিয়াছে।

শ্মশ্রুযুক্ত মূর্ত্তি।

হিন্দু-বিগ্রহের সাধারণতঃ শ্মশ্রু দৃষ্ট হয় না; ব্রহ্মা, যম, শনি ও অগ্নি ভিন্ন দেবতাগুলি শ্মশ্রুবিহীন। ইহা হইতে কেহ যেন মনে না করেন যে, ব্রহ্মার সকল মূর্ত্তিতেই শ্মশ্রু থাকিবে। আমাদের পরিষৎ-চিত্রশালায় ব্রহ্মার যে মূর্ত্তিটি (২৭৯ সংখ্যক) রহিয়াছে, তাহার কোন মুখেই শ্মশ্রু নাই। কলিকাতার সরকারি চিত্রশালাস্থ ব্রহ্মার মূর্ত্তিগুলির মধ্যে ৩৯০২ ও ৩৯০৪ সংখ্যক মূর্ত্তিদ্বয়ের শ্মশ্রু আদৌ নাই। কোন কোন মূর্ত্তির তিনটি মস্তকের মধ্যে কেবলমাত্র মধ্যেরই শ্মশ্রু আছে, পার্শ্বস্থিত দুইটি মুখে শ্মশ্রু নাই।

বৌদ্ধ ভাস্কর্য্যে ব্রহ্মামূর্ত্তি —বুদ্ধের জন্মদৃশ্য।

এই শ্মশ্রুর সঙ্গে একটা কথা মনে পড়িয়া গেল; প্রবন্ধলেখক এ সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই। বৌদ্ধযুগে ব্রহ্মার প্রতিপত্তি অল্প ছিল না। ললিতবিস্তরে উল্লেখ আছে যে, শিশু সিদ্ধার্থকে শিব, স্কন্দ, ব্রহ্মা প্রভৃতির মূর্ত্তি দেখান হইয়াছিল। বৌদ্ধ ভাস্কর্য্যেও ব্রহ্মার মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। যে দৃশ্যে লুম্বিনি উদ্যানে বুদ্ধের জন্ম প্রদর্শিত হয়, তাহাতে মাতৃ-কুক্ষি হইতে আগত বুদ্ধকে বস্ত্রখণ্ড-হস্তে গ্রহণোদ্যত ব্রহ্মার মূর্ত্তিও প্রদর্শিত হয়। এ মূর্ত্তি শ্মশ্রুবিহীন, একমুখ ও দুই হস্তযুক্ত। ব্রহ্মা যে বৌদ্ধগণ কর্ত্তৃক বিশেষ সম্মানের পাত্র ছিলেন, তাহা ব্রহ্মার মস্তকের চতুষ্পার্শ্বস্থ আভামণ্ডল দেখিয়া প্রতীয়মান হয়। ব্রহ্মার মূর্ত্তি এ স্থলে ঋষির মত নহে; ইনি অলঙ্কারযুক্ত—মণিবন্ধে বলয়, প্রকোষ্ঠে কেয়ূর, কর্ণে কুণ্ডল,

মস্তকে জটাবন্ধ ও শিরোভূষণ, কণ্ঠে হার ও বক্ষে মালা। গান্ধার-ভাস্কর্য্যে ব্রহ্মার অলঙ্কার-প্রাচুর্য্য দৃষ্ট হয়; মধ্যযুগের ভাস্কর্য্যে ব্রহ্মার অলঙ্কার-প্রাচুর্য্য একটু অল্প। আমাদের পরিষৎ মন্দিরে রক্ষিত মধ্যযুগের বুদ্ধের জন্ম-চিত্রে ব্রহ্মা দেখিলে ইহা প্রতীয়মান হইবে।

উপযুক্ত কথাগুলি হইতে কেহ যেন মনে না করেন যে, বৌদ্ধ-ভাস্কর্য্যে ব্রহ্মা সর্ব্বত্রই শ্মশ্রুবিহীনভাবে ক্ষোদিত হইতেন। বুদ্ধের জন্ম-দৃশ্যে ব্রহ্মা শ্মশ্রুবিহীন।

বুদ্ধের সপ্তপদী ভ্রমণ ও ব্রহ্মা।

জন্মের পর বুদ্ধ "সপ্তপদী" ভ্রমণ করিয়াছিলেন। এই দৃশ্যে বুদ্ধকে দেবতাদের মধ্যে দৃষ্ট হয়—বামে শক্র, দক্ষিণে ব্রহ্মা ও চতুর্দ্দিকে দেবগণ। ডাঃ গ্রুনওয়েডেল্ (Grunoedel) তাঁহার পুস্তকে (Buddhist Art in India) গান্ধারস্থ সোয়াট উপত্যকায় প্রাপ্ত প্রস্তরে ক্ষোদিত এই দৃশ্যের একটি চিত্র দিয়াছেন। তাহাতে ব্রহ্মা বুদ্ধের দক্ষিণে অবস্থিত; ইঁহার মুখ একটি; বাম হস্তে কমণ্ডলু ও দক্ষিণ হস্ত বক্ষোপরি স্থাপিত। ইঁহার মুখে শ্মশ্রু ও মস্তকে জটা; গাত্রে কোন অলঙ্কার নাই।

বৌদ্ধ-ভাস্কর্য্যে ব্রহ্মা ও ইন্দ্রের সাহচর্য্য দৃষ্ট হয়। বুদ্ধের জন্মসময়ে তাঁহাকে গ্রহণোদ্যত ব্রহ্মা, ও তাঁহার পার্শ্বে ইন্দ্র বা শক্র; সপ্তপদী ভ্রমণের সময়ও বুদ্ধের

বৌদ্ধযুগে ইন্দ্র ও ব্রহ্মার সাহচর্য্য।

একধারে ব্রহ্মা ও অপরধারে ইন্দ্র। বুদ্ধের মহাভিনিষ্ক্রমণের চিত্রেও ব্রহ্মা ও ইন্দ্রের সাহচর্য্য দৃষ্ট হয়। ব্রহ্মা সাধারণতঃ সিদ্ধার্থের মস্তকে ছত্র ধরিয়া আছেন। যখন বুদ্ধদেব সম্বোধিলাভের পর আপন জননী ও দেবগণকে লব্ধ জ্ঞানের বিষয় বলিয়া, একত্রিংশৎ স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন, তখন তাঁহার সঙ্গে ছিলেন—ব্রহ্মা ও ইন্দ্র। বারহুত স্তূপের অন্তর্গত অজাতশ স্তম্ভগাত্রে এই চিত্রটি ক্ষোদিত আছে; ইহাতে ব্রহ্মা ও ইন্দ্রের সাহচর্য্য দৃষ্ট হয়। তিনটি সিঁড়ি দিয়া এই তিনজন স্বর্গ হইতে সান্‌কিসা বা কপিথ নগরে অবরোহণ করেন। ফাহিয়ান্ ও হিওয়েনসাং যখন সান্‌কিসা দেখিতে যান, তাঁহারা এখানে বুদ্ধ, ব্রহ্মা ও ইন্দ্রের মূর্ত্তি স্থাপিত দেখিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণ্য ভাস্কর্য্যে ব্রহ্মার সহচর হয় বিষ্ণু, নয় শিব। ব্রহ্মার পার্শ্বে সময় সময় দেবর্ষি নারদের মূর্ত্তি লক্ষিত হয়। বাদামী গুহাস্থ (Badami cave) এক বরাহমূর্ত্তির দক্ষিণ পার্শ্বে ব্রহ্মা ও বাম পার্শ্বে শিব; এখানকার নরসিংহ-মূর্ত্তির উপরদেশেও শিব ও ব্রহ্মার চিত্র লক্ষিত হয়। এলোরাস্থ ডুমা গুহায় বিবাহের পর ক্রীড়ারত শিব-পার্ব্বতীর নিকট বিষ্ণু ও ব্রহ্মা রহিয়াছেন, দেখা যায়। মহামণিপুর বা মামল্লপুরে বরাহমূর্ত্তির বামপার্শ্বে ব্রহ্মামূর্ত্তি ও তাঁহার পার্শ্বে দেবর্ষি নারদের মূর্ত্তি দেখিয়াছি। ভুবনেশ্বরে ব্রহ্মার যে মন্দির দেখিয়াছি, তাহাতেও বহির্ভিত্তি-গাত্রে দেবর্ষি নারদের চিত্র ক্ষোদিত রহিয়াছে।

আধুনিক কালে বৌদ্ধধর্ম্মেও ব্রহ্মার স্থান আছে। ডাঃ গ্রুনওয়েডেল্

তাঁহার পুস্তকে শ্যামদেশাধিপতির জন্য চিত্রিত ও ত্রৈ-পুম্ ( Trai-Pum ) নামক পুস্তক হইতে গৃহীত ১৪১ বৎসরের যে প্রাচীন চিত্রের অনুকৃতি দিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়, মহাভিনিষ্ক্রমণের সময় যে চতুর্ম্মুখ ও চতুর্হস্ত ব্রহ্মা অশ্বোপরি অবস্থিত বুদ্ধের মস্তকে ছত্র ধরিয়া রহিয়াছেন, তাঁহার অপর দুই হস্তে কমণ্ডলু ও চতুর্ব্বেদ রহিয়াছে। নিও (Ni-o) নামে কথিত জাপানের মন্দিরের দ্বারদেশে অবস্থিত দেবদ্বয় ব্রহ্মা ও শক্র বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস। এখানে একটি কথা বলিয়া রাখি। কলিকাতাস্থ মহাবোধি সোসাইটির সম্পাদক শ্রীযুক্ত ধর্ম্মপাল মহাশয় বলেন যে, বিষ্ণু তাঁহাদের মন্দির ও বিহারের রক্ষক-স্বরূপ। এই হিসাবে আমি তৎকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত চৈত্যের এক কোণে বিষ্ণুর এক চিত্র স্থাপিত করিয়াছি; তিনি আমাকে এই জন্য বিষ্ণুর এক প্রস্তরনির্ম্মিত মূর্ত্তির ব্যবস্থা করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

ব্রহ্মাকে পূর্ব্বে ঋষি, ঋত্বিক্ বা পুরোহিতরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। এতক্ষণ আমি তাঁহার দেবমূর্ত্তি সম্বন্ধেই আলোচনা করিলাম। দেবমূর্ত্তিতেও ব্রহ্মার ঋত্বিকৃত্ব বা পুরোহিতত্বের চিহ্ন-স্বরূপ স্রুক্, স্রুব, কমণ্ডলু প্রভৃতি প্রদর্শিত হয়; কিন্তু ব্রহ্মার শুদ্ধ পুরোহিত্‌ভাবের মূর্ত্তিও দৃষ্ট হয়। এলোরার ডুমার লেনা বা গুহার সম্মুখস্থ বারান্দার পূর্ব্বদিকস্থ ভিত্তিগাত্রে শিব-পার্ব্বতীর বিবাহের যে দৃশ্য ক্ষোদিত রহিয়াছে, তাহাতে ব্রহ্মার পুরোহিত-মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। এ বিবাহ দেখিতে বিষ্ণু, যম, বায়ু, অগ্নি, ইন্দ্র, নির্ঋতি প্রভৃতি দেবতারা স্ব স্ব যানে চড়িয়া আসিয়াছেন; গন্ধর্ব্বেরাও আসিয়াছেন। পিতামহ ব্রহ্মার উপর পৌরোহিত্যের ভার পড়িয়াছে। তিনি শিবের বাম পার্শ্বে হোমাগ্নির সম্মুখে নতজানু হইয়া অবস্থান করিতেছেন। ব্রহ্মা ত্রিশীর্ষ, জটামুকুটধারী ও শ্মশ্রুবিহীন; ইঁহার প্রকোষ্ঠে ও মণিবন্ধে অলঙ্কার এবং গলদেশে হার শোভমান। ফাগুসন্ ও বার্গেসের মতে ডুমার লেনা খ্রীষ্টীয় ৬৫০ অব্দ ও ৭২৫ অব্দের মধ্যে উৎকীর্ণ হইয়াছিল।

ব্রহ্মার পুরোহিত মূর্ত্তি।

সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় জন্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব একত্রে ত্রিমূর্ত্তি সংজ্ঞায় অভিহিত হইলেও এই তিন দেবতার একত্র সমাবেশ এক মূর্ত্তিতে সচরাচর দৃষ্ট হয় না; আমি অদ্যাবধি এই প্রকারের একটি মাত্র মূর্ত্তি দেখিয়াছি। এলোরাস্থ কৈলাসের অন্তর্গত ও উত্তর পার্শ্বস্থ লঙ্কেশ্বর; উহার গাত্রে এই ত্রিমূর্ত্তির একটি low relief চিত্র পাওয়া যায়। কৈলাস খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে উৎকীর্ণ হইয়াছিল।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, এই ত্রিমূর্ত্তির মুখযুক্ত মূর্ত্তি।

প্রবন্ধলেখক লিঙ্গপুরাণ হইতে ব্রহ্মাপূজার লোপ সম্বন্ধে যে উপাখ্যানটি বিবৃত করিয়াছেন, আমি এলোরাস্থ দশাবতার গুহায় তাহার চিত্র দেখিয়াছি, শিবমূর্ত্তি লিঙ্গমধ্যে অবস্থিত; মূলদেশে পৌঁছিবার জন্য বরাহমূর্ত্তিতে বিষ্ণু, লিঙ্গের পাদদেশ খনন করিতেছেন; ব্রহ্মা, লিঙ্গের শীর্ষে পৌঁছাইতে অসমর্থ হইয়া শিবের বন্দনা করিতেছেন।

ব্রহ্মার শিবপূজা।

দশাবতার গুহার আর এক স্থলে দেখা যায়, শিব সূর্য্যের রথে চড়িয়া তারকাসুর বধ করিতে যাইতেছেন; ব্রহ্মা তাঁহার সারথী হইয়াছেন, এবং চতুর্ব্বেদ রথের অশ্বরূপে সংযোজিত হইয়াছে।

শিবের সারথিরূপে ব্রহ্মা।

এই দশাবতার গুহার অন্য এক স্থলে ব্রহ্মা উৎকীর্ণ রহিয়াছেন, এ চিত্রটিতে ব্রহ্মা, শেষশায়ী বিষ্ণুর নাভিদেশ হইতে উত্থিত কমলের উপর আসীন।

প্রবন্ধলেখক মহাশয় ব্রহ্মার শক্তি ব্রহ্মাণীর উল্লেখ করেন নাই। পরিকল্পনা হিসাবে ব্রহ্মার গুণগুলি তাঁহার শক্তিতেও আরোপিত। ব্রহ্মার মুখ হইতে বেদের আবির্ভাব হইয়াছিল বলিয়া, তিনি সর্ব্ববিধ জ্ঞানের অধিষ্ঠাতা বলিয়া বিখ্যাত; তাঁহার শক্তি ব্রহ্মাণী বা সরস্বতী—সর্ব্ববিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী-স্বরূপিণী। মনুসংহিতায় উল্লেখ আছে যে, গৃহস্থকে ব্রাহ্মী বা ব্রহ্মাণীর প্রিয় মুহূর্ত্তে জাগরিত হইয়া, বেদগর্ভ জ্ঞানের বিষয় ধ্যান করিতে হইবে। অতএব দেখা গেল যে, ব্রহ্মাণীর সহিতও বেদের সম্বন্ধ কল্পনা করা হইয়াছে। শিল্প-হিসাবে পুরুষ দেবতাগুলির যে যে বাহন, প্রহরণ, লাঞ্ছন প্রভৃতি দৃষ্ট হয়, তাঁহাদের শক্তিমূর্ত্তিতেও প্রায়শঃ সেইগুলিই দেখা যায়। মহীশূর রাজ্যে ভ্রমণকালে বাঙ্গালোরের উপকণ্ঠে একটি গুহার মধ্যে সপ্তমাতৃকামূর্ত্তিসজ্ঞ পরীক্ষা করিবার সময় ব্রহ্মাণীর যে মূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম, তাহার সহিত ব্রহ্মার মূর্ত্তির বিশেষ সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। ব্রহ্মাণীর মূর্ত্তি চতুর্হস্তা ও ব্রহ্মার ন্যায় আননযুক্তা, অর্থাৎ তিনটি মুখ; চতুর্থ মুখটি দেওয়ালের দিকে বলিয়া দেখা যায় না। যে আসনে উপবিষ্টা, তাহার নিম্নে হংসমূর্ত্তি উৎকীর্ণ রহিয়াছে। উপরকার দক্ষিণ ও বাম হস্তে পাশ ও কমণ্ডলু রহিয়াছে এবং নিম্ন হস্তদ্বয় যথাক্রমে বরাভয়-ব্যঞ্জক। এলোরাস্থ কৈলাসে ব্রাহ্মী বা ব্রহ্মাণীর সুন্দর মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়।

ব্রহ্মাণী বা ব্রাহ্মী মূর্ত্তি।

এবার মূর্ত্তির সময়-নিরূপণ সম্বন্ধে প্রবন্ধলেখক যাহা বলিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে দুই একটি কথার অবতারণা করিব। য়ুরোপীয় পণ্ডিতদের মত এই যে, যে মূর্ত্তি যত সাদাসিধা, তাহা ততই প্রাচীন। এ মতটি একেবারেই অগ্রাহ্য। একই যুগে সাদাসিধা ও বহু আভরণযুক্ত মূর্ত্তি দেখা যায়। গান্ধার-যুগেই সাদাসিধা ব্রহ্মার মূর্ত্তি ও বহু অলঙ্কারযুক্ত ব্রহ্মার মূর্ত্তি—দুইই দেখা যায়; এ কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ভুবনেশ্বরে ব্রহ্মার মন্দিরের ভিত্তিগাত্রে একমুখ ও দ্বিহস্তযুক্ত সাদাসিধা মূর্ত্তি দেখিয়াছি; কিন্তু মন্দিরাভ্যন্তরস্থ ব্রহ্মার মূর্ত্তিটি তত সাদাসিধা নহে। প্রবন্ধলেখক বলিয়াছেন, "ব্রহ্মার যে মূর্ত্তিতে এক মুখ দুই হাত থাকিবে, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন।" এই মতটি ভ্রমাত্মক। ভুবনেশ্বরের বহির্ভিত্তিগাত্রে ব্রহ্মার মূর্ত্তিটি ইহার অসত্যতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করে। প্রবন্ধলেখক মহাশয় ১৯০৬—৭ অব্দের আর্কিয়লজিকাল সার্ভের এনুয়েল রিপোর্টে প্রকাশিত কুজেন্‌স্ ( H. Cousens ) সাহেবের মতে সায় দিয়া বলিয়াছেন যে, খ্রীষ্টীয় দশম ও একাদশ শতাব্দীর পর হইতে ব্রহ্মার যত মূর্ত্তি দেখা যায়,

মূর্ত্তির সময় নিরূপণ।

প্রায় সব মুখেই দাড়ি আছে।" এ মতের সাহায্যে কেহ যেন মূর্ত্তির সময় নিরূপণ করিতে প্রয়াস না পান। কেন না, অনেক নব্য মূর্ত্তিতেও শ্মশ্রু দেখা যায় না, এবং অনেক প্রাচীন মূর্ত্তিতেও শ্মশ্রু দেখা যায় সাহিত্য-পরিষদে রক্ষিত ব্রহ্মার মূর্ত্তিটি ( ২৭৯ সংখ্যক ) শ্মশ্রুবিহীন; কিন্তু মূর্ত্তিটি পরীক্ষা করিয়া দেখিলে বোধ হইবে যে, ইহা দশম বা একাদশ শতাব্দী অপেক্ষা আধুনিক। আমি পূর্ব্বে গান্ধারান্তর্গত সোয়াট উপত্যকা হইতে প্রাপ্ত বুদ্ধের "সপ্তপদী ভ্রমণ" চিত্রের যে উল্লেখ করিয়াছি, তাহাতে উৎকীর্ণ ব্রহ্মা শ্মশ্রুযুক্ত। কুজেন্‌স্ সাহেব আইহোল্ হইতে যে পদ্মাসনে আসীন চতুর্মুখ ব্রহ্মার চিত্র দিয়াছেন, তাহার শ্মশ্রু নাই। ফাগু‌র্সন ও বার্গেসের মতে আইহোলের স্থাপত্য খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে। আবার কলিকাতাস্থ সরকারি চিত্রশালায় রক্ষিত এবং বিহার হইতে আনীত ৩৯০২ ও ৩৯০৪ সংখ্যার যে দুইটি মধ্যযুগের ব্রহ্মার মূর্ত্তি রহিয়াছে, তাহাদের শ্মশ্রু নাই; এবং তাহাদের পার্শ্বস্থিত একই সময়ের ও একই স্থান হইতে আনীত ব্রহ্মামূর্ত্তি শ্মশ্রুযুক্ত।

ব্রহ্মা সম্বন্ধে আর দুই একটি কথা বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব। কুজেন্‌স্ সাহেব বলিয়াছেন যে, কখন কখন জৈন-মন্দিরে ব্রহ্মার মূর্ত্তি দেখা যায়। আমি ত কোথায়ও এরূপ দেখি নাই; তবে জৈন-মন্দিরের সম্মুখে ব্রহ্মস্তম্ভ দেখিয়াছি; ইহার সহিত ব্রহ্মার কি সম্বন্ধ, তাহা অবগত নহি। দিগম্বর জৈনদিগের মতে তীর্থঙ্কর শীতলনাথের যক্ষের নাম ব্রহ্মদেব, ও তাঁহার শক্তি বা যক্ষিণীর নাম মানবী। মহীশূর প্রদেশান্তর্গত শ্রবণবেলগোলা ভ্রমণ করিবার সময় গোমতেশ্বরের মন্দিরে উঠিবার পথে অতি সুন্দর কারুকার্য্যযুক্ত ব্রহ্মস্তম্ভ বা "ত্যাগদ ব্রহ্মস্তম্ভ" দেখিয়াছিলাম, আর দেখিয়াছিলাম—হালেবিডে শীতলনাথ-মন্দিরের সম্মুখে; এই স্তম্ভের উপর ব্রহ্মদেবের যে মূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম, তাঁহার দক্ষিণ হস্তে গদা ও বাম হস্তে ফলবিশেষ রহিয়াছে।

জৈন মন্দিরে ব্রহ্মার মূর্ত্তি।

উপসংহারের পূর্ব্বে প্রবন্ধ-লেখকের দুই একটি মন্তব্য সম্বন্ধে কিছু বলা উচিত মনে করি। দক্ষযজ্ঞে যে ব্রহ্মা পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন, তাহার কারণ তিনি স্থির করিয়াছেন, "বোধ হয় শিবের প্রতি জাতক্রোধ।" এরূপ মনে করিবার কোন কারণই দেখা যায় না। শিবের ও কার্ত্তিকেয়ের বিবাহেও ব্রহ্মা পৌরোহিত্য করেন; পৌরোহিত্যই ইঁহার ব্যবসা।

ব্রহ্মার চরিত্রের উত্তম গুণ বর্ণনা করিবার সময় প্রবন্ধকার বলিয়াছেন যে, শিবের বিবাহে, এমন কি, কার্ত্তিকেয়ের বিবাহেও তিনি পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন। ইহাতে যে কি ভাল গুণ ফুটিয়া উঠিল, বুঝিতে পারা গেল না।

ব্রহ্মার পরিবারদেবতাগণ সম্বন্ধে প্রবন্ধকার যাহা বলিয়াছেন, তাহা কোন মন্দিরে দর্শন করি নাই বা কোন মন্দিরে তাহা যে আছে, এরূপ শ্রবণও করি নাই।

ব্রহ্মার পরিবারদেবতাগণ।

মূর্ত্তির সময়-নিরূপণ-প্রসঙ্গে প্রবন্ধকার বলিয়াছেন, "যাহাতে চারি মুখ, দুই হাত থাকিবে, তাহা নবীনতর। যাহার চারিমুখ দুই হাত থাকিবে, তাহা আরও নূতন" ইত্যাদি। এই দুইটি একার্থবাচী—বোধ হয়, অনবধানতাপ্রযুক্ত প্রবেশ লাভ করিয়াছে।

প্রবন্ধলেখক মহাশয় ব্রহ্মার পূজারী ব্রাহ্মণ-প্রসঙ্গে ইঁহাদের নিকটবর্ত্তী খেড়্‌ব্রহ্ম গ্রামস্থ শুক্লযজুর্ব্বেদানুযায়ী উদীচ্য ব্রাহ্মণের উল্লেখ করিয়াছেন। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তাঁহার Archaeological Survey of Mayurbhanj পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, ময়ূরভঞ্জে শাকদ্বীপী সৌর ব্রাহ্মণেরা ব্রহ্মারও পূজা করিতেন এবং সূর্য্যের মন্দিরেই ব্রহ্মার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইত। তিনি ময়ূরভঞ্জের অন্তর্গত অযোধ্যা গ্রামে একই স্থানে মিত্র বা সূর্য্য ও ব্রহ্মার মূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যে পদ্মের উপর ব্রহ্মার মূর্ত্তিটি অবস্থিত, তাহার দক্ষিণ পার্শ্বে দুইটি হংসের মূর্ত্তি উৎকীর্ণ; এই হিসাবে মূর্ত্তিটির বৈচিত্র্য আছে বলিতে হইবে।

ব্রহ্মার পূজারী ও সূর্য্যপূজা।

শ্রীমনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

( ২ )

প্রবন্ধলেখক শ্রীমান্ বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য আমার পুত্র, সুতরাং এ প্রবন্ধ-সম্বন্ধে আমার কিছু না বলাই ভাল। কিন্তু যখন সভাপতি হইয়া বসিয়াছি, তখন ভালই হোক, মন্দই হোক, দু'কথা বলিতেই হইবে। প্রবন্ধ লিখিতে বিনয় খুব খাটিয়াছে, ফাঁকি দেয় নাই। সে শুধু বই পড়িয়াই নিশ্চিন্ত হয় নাই। নিজের চক্ষে অনেক জিনিস দেখিয়াছে—অনেক ঘুরিয়া মালমসলা সংগ্রহ করিয়াছে। নবিশী লেখার মধ্যে ভালই হইয়াছে। ব্রহ্মার পূজা কখন্ আরম্ভ হয়, সে সম্বন্ধেও অনেক কথা বলা আছে। বেদে ব্রহ্ম মানে অন্ন, মন্ত্র, পরব্রহ্ম, ব্রহ্মা মানে ঋত্বিজ পুরোহিত। কিন্তু মূর্ত্তি গড়িয়া পূজা কখন্ আরম্ভ হয়, ঠিক বলা যায় না। বুদ্ধদেবের পূর্ব্বে ব্রহ্মার পূজা আরম্ভ হইয়াছে—একথা ঠিক বলা যায়। কারণ, বুদ্ধদেব যখন বোধি লাভ করেন, তখন তিনি একেবারেই নির্ব্বাণ নগরীতে প্রবেশ করিতে যাইতেছিলেন, তখন ব্রহ্মা ও ইন্দ্র দুইজনে আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, —না, তাহা হইবে না; মগধের লোক সব খারাপ হইয়া গিয়াছে, আপনি তাহাদের উদ্ধার করিয়া তবে নির্ব্বাণ প্রবেশ করিবেন। বুদ্ধদেব তাঁহাদের কথা শুনিলেন, এবং মগধে তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন।

বৌদ্ধদের মতে সুমেরুশিখর হইতে নরক পর্য্যন্ত এক একটি লোকধাতু। এখন ত্রিসাহস্র মহাসাহস্র লোকধাতু জগতে আছে। আমাদের যে লোকধাতু—ইহার নাম সহলোক; আর ব্রহ্মা ইহার পতি, সেই জন্য তাঁহার নাম ব্রহ্মাসহম্পতি। আমাদের লোকধাতু

তিন ভাগে বিভক্ত,—কামলোক, রূপলোক, আর অরূপলোক। রূপলোকে ষোলটি স্বর্গ আছে। তাহার মধ্যে আটটী ব্রহ্মার, কতকগুলি ব্রহ্মপার্ষদ দেবতাদের; আর কতকগুলি ব্রহ্মপুরোহিতগণের। সুতরাং ব্রহ্মার দলই রূপলোকের প্রায় অর্দ্ধেক দখল করিয়া আছেন।

ব্রহ্মার চারি মুখ কেন হইল? ইহার কোনও জবাব বিনয় দেয় নাই। আমার মনে হয়, শব্দের চারিটী বৃত্তি আছে—

"বৈখরী শব্দনিষ্পত্তির্মধ্যমা শ্রুতিগোচরা।
দ্যোতিতার্থা চ পশ্যন্তী সূক্ষ্মা বাগনপায়িনী॥"

১। সূক্ষ্ম নিত্য শব্দ। ২। বৈখরী, শব্দনিষ্পত্তি মাত্র। ৩। মধ্যমা শ্রুতিগোচরা, লোকের কাণে পঁহুছিলে মধ্যমা। ৪। অর্থ বোধ হইল দ্যোতিতার্থা। ব্রহ্মার চারি মুখ দিয়া এই চারি বৃত্তির উদয় হয়, তাই তাঁহার চারি মুখের দরকার। তা কালিদাস বলিয়াছেন,—

চতুর্মুখসমীরিতা।
প্রবৃত্তিরাসীচ্ছব্দানাং চরিতার্থা চতুষ্টয়ী॥

নহিলে চারি মুখ দিয়া একেবারে কথা বাহির হইলে যাত্রাদলের জুড়ীদের গানের মত কেবল গোলই হইত; কথা শুনা যাইত না।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

# বিষ্ণু *

ব্রাহ্মণ ও ইরাণজাতি প্রত্নওকসের পুরাতন অধিবাসী। এ প্রত্নওকঃ কোথায়, তাহা লইয়া অনেক বিচার আছে। বর্ত্তমান প্রসঙ্গে সে-সম্বন্ধে কোন কথা বলিব না। এই পুরাতন অধিবাসীদের কোন ইতিহাস ছিল না। ব্রাহ্মণদের রস-ভাণ্ডার বেদ আছে, আর ইরাণজাতির আছে—ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত লিপি। আর আছে অবেস্তা। আমাদের বেদ এবং ইরাণদের অবেস্তা ও লিপি পড়িলে একটা বিষয় জানিতে পারা যায়। সেটী হইতেছে, ইহাদের সৌখ্য। পূর্ব্বে যখন ইহারা এক জায়গায় ছিল—তাহারা পরস্পর পরস্পরকে ভ্রাতৃব্য বলিয়া বুঝিত। সহোদর ভ্রাতা না হইলে, আগে 'ভ্রাতৃব্য' বলিয়াই পরিচয় হইত। এখন যেমন 'পিতৃব্য' বলিলে বাপ না বুঝাইয়া খুড়া, জ্যাঠা বোঝায়, তখনও এইরূপ বুঝাইত। কিন্তু যখন ইহাদের ছাড়াছাড়ি হইয়া গেল, তখন ক্রমশঃ উভয়ের প্রতি আকর্ষণ উভয়ে ভুলিয়া গেল। বৈদিকগণ 'ভ্রাতৃব্য' বলিয়া ইরাণ-জাতিকে ভৎর্সনা করিতে লাগিল। তাই তাণ্ড্য-মহাব্রাহ্মণে দেখিতে পাই—

"এতয়া বৈ দেবা অসুরান্নতৎক্রামন্নতিপাপ্যানং ভ্রাতৃব্যং ক্রামতি য এতয়া স্তুতে।"

—ভাষ্যকার বলেন, ভ্রাতৃব্য শব্দের মানে শত্রু।

পরে যে কারণেই হউক, এমন হইল যে, দুই দলে কোন সম্পর্কই রহিল না। কি জন্য যে তাহাদের এ রকম মনোমালিন্য হইল, তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। দুঃখের বিষয়, কোন Thucydides তাহাদের এই বিবাদের ইতিহাস লিখিয়া যান নাই। এখন আসিয়ার দুইটি প্রধান বংশের পূজ্য গ্রন্থ বেদ ও জেন্দ অবেস্তা বিশেষভাবে অধ্যয়ন করিয়া, ইহাদের বিষয় কিছু জানিতে হইবে। বেদ ও অবেস্তা মিলাইয়া আমরা পাই যে, পূর্ব্বে দুই জনেরাই সূর্য্য, অগ্নি ও প্রকৃতির মহাপূজক ছিল। যদিও তাহাদের এইরূপ উপাসনার কি উদ্দেশ্য ঠিক বুঝিতে পারা যায় না, তবুও সাহস করিয়া বলিতে পারা যায় যে, উভয়েরই পূজানুষ্ঠান ছিল। উভয়েরই যজ্ঞানুষ্ঠান ছিল—তবে অনুষ্ঠান-পদ্ধতি স্বতন্ত্র ছিল। অরমজ্‌দ্ বা অহুরমজদা এবং অজ্ব্রমৈন্যুস্ ঋগ্বেদে স্বীকৃত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডল ২৪ সূক্তে বরুণকে বিচক্ষণ 'অসুর' বলা হইয়াছে। আর সেই একই সূক্তে নির্ঋতি বা পাপ দেবতার নাম করা হইয়াছে। নির্ঋতি ও অজ্ব্রমৈন্যুস্ একার্থ-বাচক। বরুণের সৃষ্টিশক্তিও যেরূপ, অরমজ্‌দেরও সেইরূপ। এত মিল থাকা সত্বেও ইহাদের যজ্ঞপদ্ধতি অন্যরূপ। যাহারা ভারতে প্রবেশ করে, তাহারা Zoroasterএর উপদেশের ঘোর বিরুদ্ধাচারী বলিয়াই বোধ হয়। উভয়েই অগ্নির পূজক; ঋগ্বেদে আছে—

---

* ১০২৮ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের ত্রয়োদশ বিশেষ অধিবেশনে পঠিত।

অগ্নিঃ পূর্বেভির্ঋষিভিরীড্যো নূতনৈরুত ( ১।১।২ )।

সায়ণ অর্থ করিয়াছেন—"অয়মগ্নিঃ পুরাতনৈর্ভৃগ্বঙ্গিরঃপ্রভৃতিভিরীড্যো স্তুত্যঃ।" বৈদিক-গণ অগ্নিকে "অগ্নিং দূতং বৃণীমহে হোতারং বিশ্ববেদসম্" বলিয়া সম্মান দেখাইয়াছেন, আর ইরাণগণ অগ্নিকে অহুমজ্‌দের পুত্র বলিয়া সম্পূজিত করিয়াছেন ( Vendidad, Farg. XIX., 112 )। দেব ও অসুরগণ উভয়েই সূর্য্যকে উপাসনা বিষয়ে একচেটিয়া করিবার জন্য চেষ্টিত ছিলেন। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ তাই বোধ হয় উপদেশ করিতেছেন—"দেবাসুরাঃ সংযত্তা আসন্। ত আদিত্যে ব্যায়চ্ছন্ত। তং দেবা সমজয়ন্।"

আদিত্য-ব্যাপার লইয়া দেবাসুরে যুদ্ধ বাধিল। দেবগণ জয়লাভ করিলেন।

ইন্দ্র-সম্পর্কেও এইরূপ বিবাদ হয়। ঋগ্বেদ ( ১।৭।১০ ) বলিয়াছেন—"অস্মাকমস্তু কেবলঃ।" ইরাণদেরও বেরেথ্‌ঘ্ন অতি মান্য দেব। বৈদিকগণ ইরাণদের গুরুকে গুরু বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তবে কয়েকজন অসুরগুরুর প্রাধান্য তাঁহারা অঙ্গীকার করেন। ইঁহারাই পুরাতন ঋষি। ইঁহারা সম্ভবতঃ প্রত্নওকসের ঋষি। অসুরগুরু শুক্রের পিতা ভৃগু। শুক্রের অপর নাম উশনা, ভার্গব, কবি। জেন্দের 'উস' (Yasna. 19.) ও উসনা বোধ হয় অভিন্ন। 'বহ্‌রম্ ইয়স্ত্'এ 'উস'কে 'কবি উস' নামে আখ্যাত করা হইয়াছে। খোর্দ অবেস্তায়ও বোধ হয় 'উশিনেমো' ও 'উশনাক' ইহাকেই লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে।

বেদ ও অবেস্তা সূর্য্য-পূজার অনেক উদাহরণ দিয়াছে। শতপথব্রাহ্মণ, তৃতীয়কাণ্ডে ( ১.৩ ১৭ ; ২.২.৪ ) উপদেশ করিয়াছেন যে, যজ্ঞ, বৎসরের পরিমাণের সমান, আর সেই বৎসরই প্রজাপতি, সেই বৎসরই বিষ্ণু। প্রজাপতি প্রাগ্-বৈদিক যুগে সোম-দেব ছিলেন—প্রাচীন চান্দ্র বর্ষের দেবতা ছিলেন এবং বিষ্ণু প্রথমে যিনি বাসুকি ছিলেন, তিনি সৌরচান্দ্র বৎসরের অধিদেব হইলেন। প্রতীচ্য পণ্ডিত Hewitt ( J.R.A.S.1890 p 319 ), বিষ্ণুকে Snake Sungod বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আর্য্যগণ ভারতে আসিবার পূর্ব্বেও ভারতের তদানীন্তন অধিবাসীদের সৌর দেবতা ছিল, তাহার মাথার চারিদিকে সর্প বিরাজ করিত, এ কথা দ্রাবিড়-সভ্যতার প্রাচীনতম যুগের আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়। আর্য্যগণ যখন ভারতে প্রবেশ করেন, তখন তাঁহারা কূট রাজনীতির অনুসরণ করিয়া ভারতের আদিম জাতির সহিত বিবাহ সম্বন্ধ করিয়া, তাহাদের মধ্যে ধর্ম্মপ্রচার করিয়া শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তাহাদের দেবতাদের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ না করিয়া বেমালুম আপনাদের ধর্ম্মের সঙ্গে মিশাইয়া লইয়াছিলেন। অন্যান্য দেশেও প্রাচীনকালে এই রীতি দেখিতে পাওয়া যায়। কোন বিশিষ্ট জাতি কোন নূতন দেশ বা জাতিকে জয় করিয়া সেই দেশবাসীর দেবতার প্রতি ঘৃণা বা তাচ্ছিল্য প্রদর্শন না করিয়া, তৎপরিবর্ত্তে সেই দেশের দেবতার প্রতি সম্মান দেখাইয়াছেন।

এখন দেখা যাইতেছে, যে আকারেই হউক, সূর্য্যপূজা প্রাগ্-বৈদিক যুগে ভারতে ও ভারতের বাহিরে প্রচলিত ছিল। বিষ্ণু সেই সূর্য্য-দেবতা।

আর এক জাতির সভ্যতার সঙ্গে ভারতীয় আর্য্য-সভ্যতার সম্পর্ক আছে বলিয়া মনে হয়। হিটাইটদিগের ধর্ম্ম কতকটা বাবিরুষ ধর্ম্মের মত। হিটাইটদিগের দেবতার তালিকায় প্রথমে সূর্য্যদেবের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন মত প্রকাশ করিবার মত উপাদান এখনও সংগৃহীত হয় নাই। তবে Boghas Keui Tabletগুলির উপর চারিটী মিতান্নি দেবতার নাম পাওয়া যায়। "Mitteilungen der deutschen Orient-Geselschaft"-নামক জর্ম্মাণ প্রাচ্য-ইতিহাসের ভূমিকা গ্রন্থের ৩৫শ অধ্যায়, ৫১ পৃষ্ঠায় এই চারিটী নাম আছে। সেই চারিটী নাম এই,—

১। mi-it-ra-as´-si-il.

২। u-ru-w-ra-as´-si-el.

৩। in-da-ra.

৪। na-s´a-at-ti-ia-an-na.

এই চারিটী নাম যে মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র ও নাসত্য, তৎসম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নাই। এইগুলি দেখিয়া কে না স্বীকার করিবে যে, হিটাইটদের সহিত খৃষ্টপূর্ব্ব দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বেও এখানকার আর্য্যের কোন না কোন সম্পর্ক ছিল? ইহাদের কত ধ্বংসাবশেষ বাহির হইয়াছে এবং হইতেছে। হয় ত কোন দিন বিষ্ণুরও সন্ধান বাহির হইয়া পড়াও অসম্ভব নয়।

বিষ্ণু বৈদিক যুগের এক পুরাতন দেবতা। ঋক্, সাম, যজুঃ, অথর্ব্ব, চারি বেদেই বিষ্ণুর কথা আছে। আর সকল বেদেই এরূপ উক্তি আছে, যাহা দ্বারা বলিতে পারা যায় যে, বিষ্ণুর স্থান দেবতাদিগের মধ্যে উচ্চই ছিল। ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন যে, বিষ্ণু ছোট দেবতা ছিলেন। এ কথা নিতান্তই অগ্রাহ্য। ঋগ্বেদে ১০৫ বার,* সামবেদে ২৪ বার, যজুর্ব্বেদে ৫৯ বার এবং অথর্ব্ববেদে ৬৬ বার বিষ্ণুর উল্লেখ আছে। সপ্তম মণ্ডলের ৩৫শ, ৩৬শ, ৩৯শ, ৪০শ, ও ৯৩ সূক্তে আরও দশজন দেবতার সঙ্গে বিষ্ণুকে বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু সেই সমস্ত সূক্তে তাঁহার গুণক্রিয়ার কোন পরিচয়ই নাই। অবশ্য এ কথা অস্বীকার্য্য নয় যে, সেই সমস্ত দেবতা সম্মানে ইন্দ্রের অপেক্ষা ছোট। ঋগ্বেদ আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বিষ্ণু বেশ জমকাল দেবতা হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। ৫ম মণ্ডলের ৩য়, ৪৬শ, ৫১শ ও ৮৭ সূক্তে অন্যান্য দেবতাদের নিকট 'রিকৃথ' প্রার্থনা করিতে দেখা যায়। কেহ কেহ লিখিয়াছেন যে, বরুণ, ইন্দ্র, অগ্নি বা সোমের মত বিষ্ণু তেমন নাম করিতে পারেন নাই। এই মত ভ্রান্ত বলিয়াই মনে হয়; কেন না, প্রথম মণ্ডলের ১৫৬ সূক্তে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বিষ্ণু মরুদ্গণসেবিত এবং রাজা বরুণ ও অশ্বিগণ তাঁহার নিকট মস্তক অবনত করিতেছেন।

"তমস্য রাজা বরুণস্তমশ্বিনা
ক্রতুং সচন্ত মারুতস্য বেধসঃ॥" ৪।

বিষ্ণু পূর্ব্বে অন্যান্য দেবতার ন্যায় একজন দেবতামাত্র থাকিলেও পরে তিনি বড় হইয়া

ইন্দ্রের সখ্যলাভের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন। আর পরে তিনি ইন্দ্রকে উপযুক্ত সখা রূপেও পাইয়াছিলেন।

ঋগ্বেদ বলিতেছেন—দৈব বিষ্ণু, যিনি নিজে সুকৃত্তর হইয়াও, সুকৃৎ ইন্দ্রের সঙ্গে সখিত্ব লাভ করিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন,—

আ যো বিবায় সচথায় দৈবঃ

ইন্দ্রায় বিষ্ণুঃ সুকৃতে সুকৃত্তরঃ॥ ১।১৫৬।০

এই বিষ্ণু যে ইন্দ্রের সখা ও সহায়ক, তাহা ঋগ্বেদ ঈরিত করিতেছে,—

'বিষ্ণোঃ কর্ম্মাণি পশ্যত যতো ব্রতানি পস্পশে।

ইন্দ্রস্য যুজ্যঃ সখা। ১।২২।১৯

ঋগ্বেদে আছে, ইন্দ্র বৃত্রকে সংহার করিতে উদ্যত হইয়া বলিলেন, সখে বিষ্ণু, বেশ ভাল করিয়া লাগিয়া যাও,—

"অথ অব্রবীদ্ বৃত্রমিন্দ্রো হবিষ্যন্

সখে বিষ্ণো বিতরং বিক্রমস্ব॥" ৪।১৮।১১

৮.৬৬।১০ ঋকে ইন্দ্রপ্রার্থিত হইয়া বিষ্ণু তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছেন। বেদে বিষ্ণু প্রাচীন বলিয়া আখ্যাত হইয়াছেন,—"যঃ পূর্ব্বায় বেধসে" (১.৫৬।২)--"যিনি পূর্ব্ব প্রাচীন যে বিষ্ণু, তাঁহার পূজা করেন।" আমরা সাধারণতঃ বলিয়া থাকি, ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা,বিষ্ণু পালনকর্ত্তা এবং প্রলয়ের অধীশ্বর ছিলেন মহাদেব। আমাদের উক্তিতে বিষ্ণুর একটী গুণ "জগৎপালন"। এই বিশেষণের সার্থকতা আমরা বেদ অনুসন্ধান করিলেও দেখিতে পাই,—

"বিষ্ণুর্গোপাঃ পরমং পাতি" (৩।৫৫।১০)—বিষ্ণু পালনকর্ত্তা, পরম স্বর্গকে রক্ষা করিয়া থাকেন। 'বিষ্ণুর্গোপা অদাভ্য' ১।২২।১৮।

বিষ্ণু, দুর্গত মানুষের জন্যই পার্থিব ধামে বিচরণ করিয়াছিলেন—'যো রজাংসি বিমমে পার্থিবানি ত্রিশ্চিদ্বিষ্ণুর্মনবে বাধিতায়।" (৬।৪৯।১৩)

বিষ্ণু পরমলোক অবগত আছেন। (বিষ্ণো দেব ত্বং পরমস্য বিৎসে ৭।৯৯।১); বিষ্ণুর শক্তিতে দ্যুলোক উর্দ্ধে অবস্থিত, তাঁহারই প্রভাবে তাহা নিপতিত হইতেছে না (৭।৯৯।২), ঋগ্বেদের কয়েকটী ঋকে তাঁহার মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। বৈদিক যুগে লোকে প্রার্থনা করিত—যাহাতে আমরা যথেষ্ট অন্ন ও প্রচুর ধনলাভ করিতে পারি, তাহার উপায় করিয়া দাও। বিষ্ণুর নিকট লোকে পার্থিব ভোগ-বস্তুর জন্য প্রার্থনা করিত।

বিষ্ণু শুধু বিশ্বকে ধারণ ও পালন করিয়া ক্ষান্ত নহেন। তিনি এই পৃথিবীকে মনুষ্যের বাসের উপযোগী করিয়া বিশেষ করিয়া নির্ম্মাণ করেন। তিনি প্রবৃদ্ধ। তিনি রজোলোকের পরপারে বাস করেন।

বিষ্ণু শতসংখ্যক কিরণবিশিষ্ট। বিষ্ণুর রূপ কিরূপ ছিল, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। তবে তিনি 'শিপিবিষ্ট'—অর্থাৎ কিরণবিশিষ্ট ছিলেন, বেদে ইহারই উল্লেখ

আছে। বৈদিক বিষ্ণু একবার নিজের রূপ পরিত্যাগ করিয়া, অন্য রূপ ধরিয়া সংগ্রামে বশিষ্ঠের সাহায্য করিয়াছিলেন। বশিষ্ঠ কিন্তু তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া স্তুতি করিতে করিতে বলিলেন,—তুমি সংগ্রামে অন্যরূপ ধারণ করিয়াছ—আমাদের নিকট হইতে তোমার রূপ লুকাইও না।

বিষ্ণু বৈদিক যুগে সাধারণের পূজা পাইতেন। সূর্য্যের নানা গুণাবলী তাঁহাতে দ্যোতিত হইয়াছে। যে কয়েকটী ঋকে শুধু তাঁহারই গুণগাথা কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাদের সংখ্যা পাঁচের বেশী নয়। বেদের যে কয়টী স্থানে বিষ্ণু পৃথক্‌ভাবে উল্লিখিত হইয়াছেন, সেই ঋক্‌গুলি আলোচনা করিলে বোঝা যায় যে, বিষ্ণু ও সূর্য্য অভিন্ন। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের একটী ঋকে দেখা যায়, বিষ্ণু তিন পদ বাড়াইয়াছিলেন—

১। ত্রীণি পদা বিচক্রমে বিষ্ণুর্গোপা অদাভ্যঃ। ১।২২।১৮

২। বিষ্ণু তাঁহার সুদীর্ঘ বিচক্রমণে ত্রিপদ দ্বারা সমস্ত জগৎকে পরিমাণ করিয়াছিলেন,—

ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং
সমূঢ়মস্য পাংসুরে॥ ঋক্—১।২২।১৭

তাঁহার প্রথম দুই পদ মনুষ্য লাভ করিতে পারে ও জানিতে পারে—কিন্তু তাঁহার তৃতীয় পদ কেহই অতিক্রম করিতে পারে না। পক্ষিগণও তত দূর গমন করিতে পারে না। এই কথাই ঋগ্বেদ এইরূপভাবে উপদেশ করিয়াছেন,—

দ্বে ইদস্য ক্রমণেস্বর্দৃশোঽভিখ্যায় মর্ত্যোভুরণ্যতি।
তৃতীয়মস্য নকিরা দধর্ষতি বয়শ্চ ন পতয়ন্ত পতত্রিণঃ॥ ১।১৫৫।৫

যাঁহারা সূরি অর্থাৎ জ্ঞানী, তাঁহারাই স্বর্গে সন্নিবিষ্ট চক্ষুর ন্যায় "পরমপদ"• দর্শন করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন,—

তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।
দিবীব চক্ষুরাততম্॥ ১।২২।২০

এই বিষ্ণুর পরমপদে মধুর উৎস বিদ্যমান, ইহাতে দেবগণ আনন্দ উপলব্ধি করিয়া থাকেন,—

তদস্য প্রিয়মভি পাথো অশ্যাং নরো যত্র দেবযবো মদন্তি।
উরুক্রমস্য স হি বন্ধুরিত্থা বিষ্ণোঃ পদে পরমে মধ্ব উৎসঃ॥ ১।১৫৪।৫

৩। বিষ্ণু সমস্ত পৃথিবী পরিক্রমণ করিয়াছিলেন, তিন বার পদনিক্ষেপ করিবার সময় ঊর্দ্ধমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন।

বিষ্ণোর্নু বীর্য্যাণি প্রবোচং যঃ পার্থিবানি বিমমে রজাংসি।
যো অস্কভায়দুত্তরং সধস্থং বিচক্রমাণস্ত্রেধোরুগায়॥ ১।১৫৪।১

৪। তিন পদবিক্ষেপে সমস্ত পৃথিবী অতিক্রম করিয়াছিলেন,—

যঃ পার্থিবানি ত্রিভি বিদ্বিগামভিরুরুক্রমিষ্টো রুগায়ায় জীবাম॥ ১।১৫৫।৪

তিন বার ভূলোক পরিক্রম করিয়াছিলেন,—

যো রজাংসি বিমমে পার্থিবানি ত্রিশ্চদ্বিষ্ণু মনবে বাধিতায়।

৫। এই পৃথিবী তিন বার প্রদক্ষিণ করিয়াছিলেন,—

বিচক্রমে পৃথিবীমেষ এতাং...ইত্যাদি। ৭।১০০।৪

ত্রির্দেবঃ পৃথিবীমেষ এতাং

ইত্যাদি। ৭।১০০।৩

৬। দেবতারা যেখানে আনন্দ করেন, বিষ্ণু তিন পদবিক্ষেপে তথায় উপনীত হইলেন।

ত্রীণ্যেক উরুগায়ো বিচক্রমে যত্র দেবাসো মদন্তি। ৮।২৯।৭

এই সমস্ত ঋকে বিষ্ণুর পদবিক্ষেপের স্থান সম্বন্ধে আমরা বলিতে পারি যে, বিষ্ণু ভূলোক, পৃথিবী, অথবা জগৎ প্রদক্ষিণ করিয়াছিলেন।

এই বিবরণের দ্বিতীয় প্রকরণের ঋকে পৃথিবী বুঝাইতে পারে, তৃতীয় প্রকরণের ঋকে তাহার সহিত স্বর্গও বুঝায়। শেষের ( ৬ ) নির্দ্দিষ্ট ঋকে বিষ্ণু পদবিক্ষেপ দ্বারা কোথায় পৌঁছিলেন, তাহাও বিবৃত হইল। কোন একটী ঋকে এক এক বিশেষ দেবতা সূচিত হইতেছে, নাম অপ্রকাশ, তবে বিশেষত্বে মনে হয়, বিভিন্ন প্রকৃতির দুই দেবতার কথা বলা হইয়াছে। তিনবার পরিক্রম করাই বিষ্ণুর বিশেষত্বসূচক, তাহা বলা যাইতে পারে না। কিন্তু যেখানে দেবতারা ও পুণ্যাত্মারা থাকেন, যেখানে সোম বিদ্যমান, সে স্থান বিষ্ণুর সর্ব্বোচ্চ পদের বিশেষত্বজ্ঞাপক বলা যাইতে পারে। স্বর্গের যে স্থানে দেবতারা আনন্দ করেন, সে স্থান নিশ্চয়ই স্বর্গের সর্ব্বোচ্চ ধাম। এই ত্রিপদ সম্বন্ধে নানা মত দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশের প্রাচীন ভাষ্যকার শাকপুণি বলেন, তিনটী পদ পৃথিবীতে, অন্তরীক্ষে ও আকাশে স্থাপিত হইয়াছিল ( পৃথিব্যাং অন্তরীক্ষে দিবীতি শাকপুণিঃ )। দুর্গাচার্য্য বলেন, ত্রিপদের অর্থ, পার্থিব অগ্নি, বিদ্যুৎ ও সূর্য্য।—পার্থিবোঽগ্নির্ভূত্বা পৃথিব্যাং যৎকিঞ্চিদস্তি তদ্বিক্রমতে, তদধিতিষ্ঠতি; অন্তরীক্ষে বিদ্যুতাত্মনা; দিবি সূর্য্যাত্মনা।" বাজসনেয়ী সংহিতার ভাষ্যকার কার্য্যতঃ এই মতই মানিয়া লইয়াছেন। তিনি অর্থ করেন—অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য। বাজসনেয়ী সংহিতা, তৈত্তিরীয় সংহিতা এবং শতপথব্রাহ্মণে বরাবরই এই অর্থই গৃহীত হইয়াছে। Max Muller ও Oldenburg এই মতের অনুবর্ত্তী। কিন্তু ঔর্ণবাভ এই মত স্বীকার করেন না। তিনি বলেন,— "সমারোহণে, বিষ্ণুপদে গয়াশিরসি।" সমারোহণে অর্থাৎ উদয়গিরিতে সমুত্থানপূর্ব্বক একপদ নিধান করেন। [ নিরুক্ত, ১২শ অধ্যায়—দ্বিতীয় পাদ, ১৯ ] রামায়ণের চতুর্থ কাণ্ডেও এই অর্থের সার্থকতা দেখিতে পাওয়া যায়,—

তত্র পূর্ব্বপদং কৃত্বা পুরা বিষ্ণুস্ত্রিবিক্রমঃ।
দ্বিতীয়ং শিখরে মেরোশ্চকার পুরুষোত্তমঃ॥ ৪০।৫৭

কাশীপ্রসাদ জয়স্বাল ( Ind. Ant. 1918. p. 84. ) মনে করেন যে, বিষ্ণু সত্য সত্যই গয়াপর্ব্বতোপরি বিষ্ণুপাদে সমুত্থিত হইয়া বিচক্রমণ করেন।

বেদে উক্ত আছে যে, অদিতিনন্দন বা আদিত্য সংখ্যায় সাত বা আট। শতপথ-ব্রাহ্মণে এক বার অষ্ট আদিত্যের কথা বলা হইয়াছে, আর একবার বলা হইয়াছে যে, আদিত্যগণ সংখ্যায় দ্বাদশটী। আর বিষ্ণু আদিত্যদিগের মধ্যে একজন। মহাভারতেও অদিতি-পুত্র ১২জন আদিত্যের উল্লেখ আছে এবং বিষ্ণুই দ্বাদশ আদিত্য; বিষ্ণু গুণে ও গরিমায় অন্যান্য আদিত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বিষ্ণুর সৌরত্ব প্রমাণ করিতে বিশেষ আয়াস পাইতে হয় না। বিষ্ণুকে যে অনেক করিয়া বড় হইতে হইয়াছে, তাহা আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি। শতপথব্রাহ্মণে উল্লেখ আছে যে, বিষ্ণু দেবতাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিলেন। অন্যান্য দেবেরা তাঁহার প্রতি ঈর্ষান্বিত হইলেন এবং নানা কৌশলে তাঁহার মস্তককে দেহচ্যুত করাইলেন। কিন্তু এমন ঘটনা হইল, যাহাতে তাঁহারা শীঘ্র আপনাদের ভুল বুঝিয়া ভীত হইয়া পড়িলেন এবং বিষ্ণুকে পুনঃ প্রাপ্তির জন্য ইচ্ছা করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে পাইবার উদ্দেশ্যে তাঁহারা স্বর্বৈদ্য অশ্বিদ্বয়ের আরাধনা করিতে লাগিলেন। ফলে বিষ্ণু পুনর্জীবিত হইয়া দেবতাদের মধ্যে আসিলেন। এই বিষ্ণু আদিত্য—সূর্য্যনারায়ণ। বেদে বিষ্ণুর আর এক মূর্ত্তির কল্পনা আছে। এটী তাঁহার যজ্ঞমূর্ত্তি। শতপথব্রাহ্মণেও বিষ্ণুর যজ্ঞমূর্ত্তির কথা কয়েকবার উল্লিখিত আছে। যজ্ঞনারায়ণরূপে আজও বিষ্ণু পূজিত হইয়া থাকেন।

ঋগ্বেদের সংহিতাভাগে বিষ্ণুর স্থান যেরূপ ছিল, তাহা আমরা আলোচনা করিয়াছি। ব্রাহ্মণ ভাগে বিষ্ণুর বিশেষ সমাদরের উপক্রম হইতে আরম্ভ হয়, ইহা ব্রাহ্মণ আলোচনা করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায়। রামায়ণ, মহাভারত ও পৌরাণিক যুগে বিষ্ণু পরম-পুরুষের স্থান অধিকার করেন। বিষ্ণু কেন এই শ্রেষ্ঠ পদ প্রাপ্ত হইলেন, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, জনগণ তাঁহার তৃতীয় পদ অর্থাৎ মানবজ্ঞানের অতীত পরমপদের প্রতি এতই শ্রদ্ধাবান্ হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, পরিশেষে বিষ্ণুকে এই শ্রেষ্ঠতম পদ প্রদান করেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ উপদেশ করিয়াছেন,—

"অগ্নির্বৈ দেবানামবমো বিষ্ণুঃ পরমস্তদন্তরেণ সর্ব্বা অন্যা দেবাঃ"। ১।১

ঐ যে অগ্নি, তিনি দেবগণের অবম ( প্রথম ), আর বিষ্ণু দেবগণের পরম ( অন্তিম ); অন্য দেব ইঁহাদের মধ্যে অবস্থিত।

শ্রুতিতে অগ্নিকে দেবতাগণের মুখ-স্বরূপ ও প্রথম এবং বিষ্ণুকে উত্তম অর্থাৎ অন্তিম বলা হইয়াছে।

"অগ্নির্মুখং প্রথমো দেবতানাং সঙ্গতানামুত্তমো বিষ্ণুরাসীৎ।"

অন্য দেবগণ অর্থে অগ্নিষ্টোমের অঙ্গীভূত শাস্ত্র-প্রতিপাদ্য ( শাস্ত্র-গীতিরহিত ঋকৃস্তুতিবিশেষ—আনন্দগিরি, তৈত্তি., উপ., ১।৮ ) ইন্দ্র, বায়ু প্রভৃতি প্রধান দেবতা

কয়েকজনকে বুঝাইতেছে। অগ্নি ও বিষ্ণু তাঁহাদের আদিতে ও অন্তে রক্ষকবৎ বর্ত্তমান।

শতপথব্রাহ্মণ ও তৈত্তিরীয় আরণ্যকে একটী কাহিনীর উল্লেখ আছে। দেবতাগণ শ্রী, শৌর্য্য ও অন্নলাভের জন্য এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। দেবগণ প্রস্তাব করিলেন যে, তাঁহাদের মধ্যে যিনি তাঁহার নিজ ক্রিয়া দ্বারা অন্যান্য দেবের পূর্ব্বে যজ্ঞের চরম সিদ্ধি লাভ করিতে পারিবেন, তিনিই দেবগণের মধ্যে প্রথম ও প্রধান স্থান লাভ করিবেন। বিষ্ণু অন্য সকলের পূর্ব্বেই তাহা লাভ করেন; সুতরাং তিনি দেবতাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান প্রাপ্ত হন এবং এই জন্যই বিষ্ণুকে দেবগণের শ্রেষ্ঠ বলা হইয়া থাকে।

এই কাহিনীটী নিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বেই কিন্তু বিষ্ণু "পরমপদ" লাভ করিয়াছিলেন। বোধ হয়, তাঁহার পরমপদ-প্রাপ্তির কারণ নির্দ্দেশ করিবার জন্যই এই কাহিনীর সৃষ্টি হইয়া থাকিবে।

আবার এই একই ব্রাহ্মণে বামনরূপী বিষ্ণুর কাহিনী আছে। এই কাহিনী উপদেশ করে যে, এক সময়ে সুর ও অসুরগণের মধ্যে যজ্ঞের স্থান লইয়া বিবাদ হয়। অসুরগণ বলেন যে, তাঁহারা সুরদিগকে শয়ান বামনদেহের পরিমিত স্থান প্রদান করিতে স্বীকৃত আছেন। কাজেই বিষ্ণুকে শয়ন করিতে হইল। কিন্তু তিনি এরূপভাবে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইলেন যে, তিনি সমস্ত পৃথিবী নিজ শরীর দ্বারা ব্যাপিয়া ফেলিলেন; সুতরাং দেবতারা সমস্ত পৃথিবীই প্রাপ্ত হইলেন। সুরগণের যজ্ঞানুষ্ঠানও সুসিদ্ধ হইল।

এই কাহিনীতে বিষ্ণুর প্রতি অপূর্ব্ব অত্যাশ্চর্য্য-শক্তি আরোপ করা হইয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া ইহাতে যে তাঁহাকে পরমপুরুষ বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে, এরূপ বুঝায় না।

মৈত্রেয়ানী উপনিষদের ষষ্ঠ প্রপাঠকে বিশ্বভৃৎ অন্নকে ভগবদ্‌বিষ্ণুর তনু বলা হইয়াছে।

"বিশ্বভৃৎ বৈ নামৈষা তনুর্ভগবতো বিষ্ণোর্যদিদমন্নম্"।

কঠোপনিষদে কিন্তু বিষ্ণুকে পরমপুরুষ বা ব্রহ্ম বলিয়াই গ্রহণ করা হইয়াছে। যে ব্যক্তি বিজ্ঞানসারথি ও মনঃপ্রগ্রহবান্, তিনিই পন্থার অপর পারে গমন করেন, তিনিই বিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হন।

"বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃপ্রগ্রহবান্নরঃ।
সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥—৩য় বল্লী। ৯।

ইহাতে মানবাত্মার গতি পর্য্যটনরূপে বর্ণিত হইয়াছে। মানব এইরূপ ভ্রমণ করিতে করিতে পথের শেষে উপনীত হইলে, পরমপদ প্রাপ্ত হয়। এই পরমপদই জীবের চরম লক্ষ্য—ইহাই তাহার অনন্ত সুখ-নিকেতন।

অতঃপর বিষ্ণুকে গৃহদেবতারূপেও পূজিত হইতে দেখা যায়। বিবাহের সপ্তপদী

রীতিতে আপস্তম্ব, হিরণ্যকেশী ও পারস্করের গৃহ্যসূত্রমতে কন্যা যখন চতুর্থ পদ প্রক্ষেপ করে, তখন বরকে বলিতে হয়, "বিষ্ণু তোমাকে নয়ন করুন", "বিষ্ণু তোমার সহিত অবস্থান করুন।"

রামায়ণ ও মহাভারত-যুগে বিষ্ণু সর্ব্বথা ব্রহ্মপদবাচী হইয়াছিলেন। ভীষ্মপর্ব্বের ৬৫ ও ৬৬ অধ্যায়ে ব্রহ্মকে নারায়ণ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে বিষ্ণু ও বাসুদেব যে অভিন্ন, তাহা বলা হইয়াছে।

## বৈদিক যুগে অবতারের ইঙ্গিত

মৎস্য, ভাগবত ও অগ্নিপুরাণে বর্ণিত আছে যে, বিষ্ণুর অবতার একটি মৎস্যের দ্বারা মানবের আদিপুরুষ মনু রক্ষা পাইয়াছিলেন। এই পুরাণগুলির বর্ণনা ও মহাভারতের বর্ণনা একই রকমের। তবে মহাভারতে বিষ্ণুর পরিবর্ত্তে ব্রহ্মা প্রজাপতিই মৎস্যাবতার হইয়াছিলেন। শতপথব্রাহ্মণে ( ১।৮।১।১ ) কাহারও অবতারের কথা কিছু নাই। আছে শুধু একটী মৎস্য মনুকে জলপ্লাবন হইতে রক্ষা করেন। মৎস্য ও কূর্ম্মের অবতার পরে বিষ্ণুর সঙ্গে জুড়িয়া দেওয়া হয়।

বরাহ ও বামন অবতারের মূল ঋগ্বেদ হইতে বাহির করিতে পারা যায়। আর সেই দুইটী অবতারের সঙ্গে বিষ্ণুর সম্পর্ক আছে।

### বামন অবতার

অসুররাজ বলির হস্ত হইতে লোক-রক্ষার জন্য বিষ্ণুর ত্রিপদগমন অবলম্বন করিয়া বামন অবতারের কথা রচিত। রামায়ণে এই অবতারের কথা এইরূপ,—

বিরোচনপুত্র বলি দেবেন্দ্র ইন্দ্রকে জয় করিয়া ত্রিলোক শাসন করেন। তখন ইন্দ্র অন্যান্য দেবতাদের সহিত বিষ্ণুর নিকট গিয়া বলেন, বলি যজ্ঞ করিতেছেন। যজ্ঞান্তে তিনি দানে সকলের মনোবাসনা পূর্ণ করিবেন। বামনরূপ ধরিয়া বলির নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করিবার জন্য তাঁহারা বিষ্ণুকে অনুরোধ করিলেন। বিষ্ণুও তাঁহাদের অনুরোধক্রমে বামনরূপ ধরিয়া, বলির নিকট ত্রিপদপরিমিত স্থান প্রার্থনা করিলেন। বলি তাহা দান করিতে স্বীকার করিলে, তিনি আশ্চর্য্য মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, প্রথম পদে সমগ্র পৃথিবী অধিকার করিলেন। দ্বিতীয় পদে অন্তরীক্ষ ও তৃতীয় পদে আকাশ অধিকার করিলেন। তার পর, বলিকে পাতালে পাঠাইয়া তিনি ইন্দ্রকে পুনরায় ত্রিলোকের অধীশ্বর করিলেন। মহাভারত ও অন্যান্য পুরাণের আখ্যান-বস্তু একই রকমের।

শতপথব্রাহ্মণে ( ১।২।৫ ) আখ্যায়িকাটী এইরূপ,—অসুরগণ দেবতাদের জয় করিয়া পৃথিবী ভাগ করিতে লাগিলেন। দেবতাগণ যজ্ঞরূপী বিষ্ণুকে অগ্রে করিয়া তাহাদের নিকট আসিলেন এবং বলিলেন,—আমাদেরও পৃথিবীর কিছু ভাগ দাও। তাহারা দেবগণকে বলিল, বিষ্ণু শয়ন করিয়া যতটুকু অধিকার করিতে পারিবেন,

তাহারা দেবতাদের তত কু স্থান দিবে বিষ্ণু বামন হইলেন। দেবতারা অসুরদের প্রস্তাবে রাজি হইল। তাহারা ভাবিল, তাহারা যখন যজ্ঞ-পরিমিত ভূমি পাইয়াছে, তখন তাহারা যথেষ্টই পাইয়াছে। তারপর বিষ্ণুর সহিত যজ্ঞ করিয়া তাহারা সমগ্র পৃথিবী পাইল। এই আখ্যায়িকায় বিষ্ণুর ত্রিপদ সম্বন্ধে কোন কথাই নাই। কিন্তু শতপথব্রাহ্মণের অন্যত্র ( ১।৯।৩।৯ ) দেখিতে পাওয়া যায় যে, বিষ্ণু তিন পদবিক্ষেপ দ্বারা দেবতাদের জন্য সর্ব্বব্যাপক শক্তি লাভ করিয়াছিলেন।

তৈত্তিরীয় সংহিতায় ( ৬।২।৪ ) এ সম্বন্ধে একটী কাহিনী আছে। পূর্ব্বে পৃথিবী অসুরদিগেরই ছিল। কেবল একজন মানুষ বসিয়া যত দূর দেখিতে পায়, তৎপরিমিত ভূমি দেবতাদের ছিল। যখন দেবতারা পৃথিবীর ভাগ চাহিল, তখন অসুরগণ বলিল, তোমাদিগকে কতটুকু স্থান দেওয়া হইবে? দেবতারা উত্তর দিল, "এই শৃগালী তিন পদচারণে যত দূর যাইতে পারে, তত দূর।" অসুরেরা স্বীকার করিল। তখন ইন্দ্র শৃগালীর বেশ ধরিয়া, তিন পদবিক্ষেপে সমস্ত পৃথিবী গমন করিল। ইহাতে দেবতারা পৃথিবীর অধিকার লাভ করিল। এখানে ত্রিপদ আছে বটে, কিন্তু বিষ্ণুর পরিবর্ত্তে ইন্দ্রের। ঋগ্বেদে এই দুই দেবতার স্তব বহু স্থলে একত্র নিবদ্ধ থাকায় বোধ হয়, বিষ্ণুর স্থানে ইন্দ্রের আদেশ হইয়া থাকিবে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ( ৬।১৫ ) আছে যে, ইন্দ্র ও বিষ্ণু অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। তিন পদক্ষেপে বিষ্ণু যত দূর যাইতে পারিবেন, তাহা ইন্দ্র ও বিষ্ণুর প্রাপ্য হইবে—এই সর্ত্তে অসুরেরা সম্মত হয়। বিষ্ণু তদনুসারে লোকসমুদয়, বেদ ও বাক্য অতিক্রম করেন। তারপর ঋগ্বেদে বহুবার বিষ্ণুর ত্রিপদ বিক্রমণের কথা পাওয়া যায়। তৎসম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি।

কূর্ম্ম ও মৎস্য অবতারের প্রাচীনতম আখ্যায়িকা শতপথব্রাহ্মণে দেখিতে পাওয়া যায়। ভাগবত-পুরাণকার বলেন, জলপ্লাবনে নষ্ট বস্তু উদ্ধারের জন্য ক্ষীরোদসাগরে বিষ্ণু কূর্ম্মাকৃতি ধারণ করিয়াছিলেন। দেবাসুরগণ সেই সাগর মন্থনে যোগ দিয়াছিল ( ভাগবত, ১।৩।১৬ )। এই বিবরণের সঙ্গে ব্রাহ্মণযুগের বিবরণের তুলনা করিলে দেখা যায় যে, শতপথব্রাহ্মণে লিখিত আছে যে, প্রজাপতি প্রজাসৃষ্টির পূর্ব্বে কূর্ম্মাকার ধারণ করিয়াছিলেন ( ৭।৫।১।৫ ); তৈত্তিরীয় আরণ্যকেও ( ১।২৩।৩ ) দেখা যায়, প্রজাপতির মেদাংশ কূর্ম্মাকার ধারণ করিয়া জলে বিচরণ করিয়াছিলেন। এখনও নষ্ট বস্তুর উদ্ধারের জন্য বিষ্ণুর মৎস্যাবতারের কথা বলা হয় নাই। প্রজাসৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রজাপতি কূর্ম্মাকার ধারণ করিয়াছিলেন।

নরসিংহ অবতারের সূত্র বা ইঙ্গিত বৈদিক সাহিত্যে তৈত্তিরীয় আরণ্যকে ( ১০।১।৬ ) একবার মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে বৈদিক সাহিত্যের আর কোথাও কিছু পাওয়া যায় না।

বেদে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর কথা আছে। ব্রাহ্মণ-যুগে সৃষ্টিকর্ত্তা প্রজাপতি জীবের আপৎকালে কয়েকটী রূপ ধারণ করিয়া কূর্ম্ম বরাহাদি রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তার পর নারায়ণের অস্তিত্ব আমরা উপনিষদে সর্ব্বপ্রথম উপলব্ধি করি। বেদে নারায়ণের নাম-গন্ধ নাই। তবে ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে (৮২।৫।৬) দেখিতে পাই,—

পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যা পরো দেবেভিরসুরৈর্যদস্তি।
কং স্বিদ্গর্ভং প্রথমং দধ্র আপো যত্র দেবাঃ সমপশ্যন্ত বিশ্বে।
তমিদ্গর্ভং প্রথমং দধ্র আপো যত্র দেবাঃ সমগচ্ছন্ত বিশ্বে।
অজস্য নাভাবধ্যেকমর্পিতং যস্মিন্ বিশ্বানি ভুবনানি তস্থুঃ॥

বেদের এই বাণী উপদেশ করিতেছে,—যখন আকাশ ছিল না, পৃথিবী ছিল না, দেবগণও ছিলেন না, তখন যাহা জলে ভাসিয়াছিল এবং দেবগণ যাহার মধ্যে অবস্থান করিয়াছিলেন, সেই যে অণ্ড, তাহা কি? দেবগণ যে অণ্ডমধ্যে অবস্থিত, তাহা জলমধ্যে অবস্থিত ছিল। জন্মরহিত যিনি, তাঁহার নাভির উপর এমন কিছু অবস্থিত ছিল, যাহার মধ্যে সকল প্রাণীই ছিলেন। জন্মরহিত যিনি নারায়ণ-পদবাচ্য হইলেন, তাঁহার নাভির উপরিস্থিত যে অণ্ড, তাহা ব্রহ্মা হইলেন।

নারায়ণ জলমধ্যে অবস্থিত ছিলেন। মনু ও পুরাণের বচনে বিষয়টী বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। মনু বলেন, জলের নাম 'নারা'; কারণ, জলই বস্তুতঃ নরের পুত্র। জল ব্রহ্মার প্রথম আশ্রয় বা অয়ন ছিল বলিয়া, পরমপুরুষের নাম নারায়ণ। বৈদিক এই বাণীর সঙ্গে নারায়ণের অভিন্নতা ঘটাইয়া উপনিষদ্‌যুগে নারায়ণ পরমপুরুষ-পদবাচ্য হইলেন। কাজেই পরমপুরুষ পদবাচ্য বিষ্ণুর সহিত তাহার অভিন্নতা প্রতিপাদিত হইয়া গেল। এইরূপে আবার বৈদিক যুগের শেষভাগে সকলের প্রিয় দেবতা বাসুদেব ও বিষ্ণুর একত্ব—অভিন্নতা সম্পাদিত হইল। এই নারায়ণ ও বাসুদেব সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক।

হিন্দু চিরদিনই নারায়ণ শব্দের সহিত পরিচিত। বেদ, উপনিষৎ, মহাকাব্য ও পুরাণের যুগে হিন্দু যেমন নারায়ণের নাম উচ্চারণ করিত, এখনও সে তেমনই করিয়া থাকে। ভক্তিতে হউক বা না হউক, আজও তাঁহার সেই নারায়ণ নাম তাঁহার ভিতর বাহিরে সাড়া দিয়া থাকে। এই পরিদৃশ্যমান জগৎ ও ভূতসমষ্টি যে পুরুষ হইতে জন্মিতেছে, সঞ্জীবিত হইয়া থাকিতেছে এবং পরিশেষে যে পুরুষেই লয় প্রাপ্ত হইতেছে, তিনি পরব্রহ্ম নারায়ণ। বেদ ইঁহাকে প্রথম পুরুষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শতপথ-ব্রাহ্মণে সর্ব্বপ্রথম পুরুষ নারায়ণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই পুরুষ নারায়ণ ও পরমতত্ত্ব নারায়ণ বোধ হয়, পূর্ব্বে একতত্ত্ব ছিলেন না; কেন না, শতপথব্রাহ্মণে (১২।৩।৪) দেখিতে পাওয়া যায় যে, পুরুষনারায়ণ যজ্ঞ করিতেছেন, যজ্ঞভূমি হইতে বসু, রুদ্র ও আদিত্য-সকলকে প্রেরণ করিতেছেন। যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে, প্রজাপতি তাঁহাকে পুনরায়

যজ্ঞ করিতে বলিলেন। যজ্ঞ করিয়া নারায়ণ সর্ব্বভূতে ওতপ্রোত হইয়া পরমাত্মায় ওতপ্রোত হইলেন এবং পরমাত্মায় পরিণত হইলেন। শতপথের আর এক স্থানে (১৩।৬।১) দেখিতে পাওয়া যায়, পুরুষ-নারায়ণ পঞ্চরাত্র সত্র করিবেন বলিয়া মনঃস্থ করিলেন। এই সত্রের উদ্দেশ্য এই যে, তিনি সকল জীবের শ্রেষ্ঠতম হইবেন এবং সকল প্রাণীর অন্তরাত্মা হইবেন।

তিনি সত্র সম্পন্ন করিয়া অন্তরাত্মাই হইয়াছিলেন। গর্ভোপনিষৎ ও মহোপনিষৎ নারায়ণকে পরম ব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আত্মপ্রবোধ উপনিষৎ ও সাকল্যোপনিষদে তিনি পরমতত্ত্ব বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন। মৈত্রেয়োপনিষৎ, বাসুদেবোপনিষৎ, স্কন্দোপনিষৎ, রামোপনিষৎ, রামতাপনীয়োপনিষৎ এবং মুক্তিকোপনিষদে নারায়ণের মাহাত্ম্য বিঘোষিত হইয়াছে।

ব্রাহ্মণগ্রন্থ ও উপনিষৎ আলোচনা করিলে বোঝা যায় যে, নারায়ণ বেদের পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণভাগে পরমপুরুষ পরতত্ত্ব বলিয়া পূজিত হইতেন। প্রামাণিক উপনিষদের মধ্যে ছান্দোগ্য উপনিষদে দেবকীপুত্র ও নারায়ণ একতত্ত্ব বলিয়া উক্ত আছে। তৎকালে বাসুদেবের অর্চ্চনার কথা বিশেষ জানা যায়। বাসুদেবের উপাসনা পরিজ্ঞাত থাকিলেও তাহা প্রচলিত ছিল বলিয়া বোধ হয় না। রামায়ণ ও মহাভারত-যুগে বাসুদেবের উপাসনা প্রচলিত হয়। ইহার পূর্ব্বে সম্ভবতঃ নারায়ণোপাসনা প্রচলিত ছিল। পৌরাণিক যুগে যখন বাসুদেবের উপাসনা প্রচলিত হয়, তখন বাসুদেব নারায়ণের সহিত একত্ব লাভ করেন।

তৈত্তিরীয় আরণ্যকের নারায়ণোপনিষদে নারায়ণ-উপাসনার একটী মন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়। সেটী এই,—

"নারায়ণায় বিদ্মহে বাসুদেবায় ধীমহি তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ।" ( ১০।১।৬ )

বৃহদারণ্যক-ভাষ্যে শ্রীমৎ-শঙ্করাচার্য্য চতুর্ব্যূহদের আলোচনা করিয়াছেন। বেদান্ত-ভাষ্যেও তিনি চতুর্ব্যূহবাদের কথা বলিয়াছেন। সেখানে তিনি নারায়ণের চতুর্ব্যূহবাদ ভাগবত-মত বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে ভাগবতমতের এই চতুর্ব্যূহ-বাদ অগ্রাহ্য। আনন্দগিরি, বৃহদারণ্যক-ভাষ্যে চতুর্ব্যূহবাদকে দ্রবিড়াচার্য্যের মত বলিয়া বিবৃত করিয়াছেন। শ্রীরামানুজাচার্য্য শাঙ্কর মত খণ্ডনচ্ছলে বলিয়াছেন যে, "সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ যখন নিশ্চয়ই পরব্রহ্মস্বরূপ, তখন তৎপ্রতিপাদক শাস্ত্রের প্রামাণ্য কখনই ব্যাহত হইতে পারে না। যাঁহারা ভাগবত শাস্ত্রের ( পঞ্চরাত্র শাস্ত্রের ) প্রতি-পাদন-প্রণালী অবগত নহেন, তাঁহারাই এইরূপ আপত্তি উত্থাপন করিয়া থাকেন যে, উক্ত জীবোৎপত্তিবাদ শ্রুতিবিরুদ্ধ। কেন না, আশ্রিতবৎসল পরব্রহ্মই আশ্রিত ব্যক্তি-বর্গের আশ্রয় প্রদানার্থ স্বেচ্ছায় আপনাকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া অবস্থান করিতেছেন, ইহাই তাঁহাদের প্রতিপাদনপ্রণালী। যথা,—পৌষ্করসংহিতায়—"যাহাতে গুরু-শিষ্য-

ভাবাপন্ন ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তব্যবুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া চতুর্ব্যূহের উপাসনা করেন, তাহাই আগম অর্থাৎ পাঞ্চরাত্রশাস্ত্র।" সেই চাতুরাত্মোপাসনাই যে বাসুদেবসংজ্ঞক পরব্রহ্মের উপাসনা, তাহাও এই সাত্বতসংহিতায় উক্ত হইয়াছে। নিত্যসিদ্ধ ষড়্‌বিধগুণ-সম্পন্ন এবং সূক্ষ্মব্যূহরূপ বিশিষ্টসম্পত্তিশালী সেই বাসুদেবসংজ্ঞক পরব্রহ্মকে ভক্তগণ আপন আপন অধিকারানুসারে জ্ঞানসহকৃত কর্ম্মদ্বারা অর্চ্চনা করিয়া সম্যক্‌রূপে প্রাপ্ত হন। তাঁহারা বলেন,—ভগবদ্বিভব অর্চ্চনার প্রথমে ব্যূহপ্রাপ্তি হয়, তাহার পর ব্যূহের আরাধনায় আবার বাসুদেবাখ্য সূক্ষ্ম পরব্রহ্মের প্রাপ্তি হয়। বিভব শব্দের অর্থ—রাম কৃষ্ণাদি অবতারসমূহ। ব্যূহ বলিলে বুঝিতে হইবে—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধরূপ চতুর্ব্যূহ। আর সূক্ষ্ম তত্ব হইতেছেন—কেবলই ষড়্‌বিধ নিত্যসিদ্ধ-গুণময় দেহধারী বাসুদেব নামক পরব্রহ্ম। পৌষ্করসংহিতা বলিয়াছেন,—

"যস্মাৎ সম্যক্ পরং ব্রহ্ম বাসুদেবাখ্যমব্যয়ম্।
অস্মাদবাপ্যতে শাস্ত্রাৎ জ্ঞানপূর্ব্বেণ কর্ম্মণা॥"

অতএব যেহেতু সংকর্ষণাদি ব্যূহত্রয় এই পরব্রহ্মেরই স্বেচ্ছাকৃত শরীরস্বরূপ, সেই হেতুই "অজায়মানো বহুধা বিজায়তে"—'যিনি জন্মরহিত হইয়াও বহুপ্রকারে আবির্ভূত হইয়া থাকেন।' এই শ্রুতিতে প্রসিদ্ধ যে, ভগবানের আশ্রিত-বাৎসল্য-নিবন্ধন, স্বীয় ইচ্ছাকৃত অথচ পাপপুণ্য-কর্ম্মাধীন নহে, এরূপ শরীর-ধারণরূপ জন্মপ্রতিপাদন করায়, তৎপ্রতিপাদক শাস্ত্রের প্রামাণ্য নিষিদ্ধ হইতে পারে না। এই শাস্ত্রে সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ, এই ব্যূহত্রয়ই জীব, মন ও অহঙ্কার নামক তত্ত্বত্রয়ের অধিষ্ঠাতা বা পরিচালক। মহাভারতের নারায়ণীয় পর্ব্বাধ্যায়ে লিখিত আছে যে, নারদ শ্বেতদ্বীপে গমন করিয়া পরমপুরুষের উপাসনায় নিরত হইলে, পরমপুরুষ নারায়ণ তাঁহার নিকট আত্মপ্রকাশ করিয়া বলিলেন, ঐকান্তিকতা ব্যতীত কেহই তাঁহাকে দেখিতে পায় না। নারদ তাঁহাতে একান্ত নিরত, তাই তিনি নারদকে দেখা দিলেন। তৎপরে তিনি নারদের নিকট বাসুদেবধর্ম্ম বিবৃত করিলেন। তিনি বলিলেন, বাসুদেব পরমাত্মা ও সকল জীবের অন্তরাত্মা। তিনি পরমস্রষ্টা। তিনি সঙ্কর্ষণ-মূর্ত্তিতে সকল জীবের অধিষ্ঠাতা। সঙ্কর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্ন বা মনের উৎপত্তি। প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধ বা অহঙ্কার উৎপন্ন হইয়াছে। পরমপুরুষ বলিলেন, যাহারা আমার উপরি-উক্ত বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই মূর্ত্তিচতুষ্টয়ে প্রবেশ করে, তাহারা বিমুক্ত হয়। এই চতুর্ব্যূহবাদ বহুদিন হইতেই চলিতেছে। বৌদ্ধদিগের আজীবক সম্প্রদায় বা মগ্‌গলী-পুত্ত-মতবাদে ব্যূহবাদের সামান্যরূপ ইঙ্গিত আছে বলিয়া বোধ হয়। মৌর্য্যদিগের সময় যে ব্যূহবাদ বিশেষরূপে প্রচলিত ছিল, তাহা তৎকালে এবং কিয়ৎকাল পরে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ প্রভৃতি বিগ্রহপূজায় বেশ বুঝিতে পারা যায়। পাণিনি সূত্রে ( ৬।৩।৯৮ ) বাসুদেব শব্দ আছে। পতঞ্জলি তাঁহার মহাভাষ্যে এই শব্দটিকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়া-

ছেন যে, ইহা কোন ক্ষত্রিয়ের নাম নহে, ইহা সেই পরম উপাস্যের নাম। উল্লিখিত নির্দ্দেশে "বাসুদেব" "বলদেব" শব্দ দৃষ্ট হয়। স্যর রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর ও গোপীনাথ রাও সংবাদ দিয়াছেন যে, নানাঘাটের বৃহৎ গুহায় একখানি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। ঐ শিলালিপিতে অন্যান্য দেবের নামের সহিত দ্বন্দ্বসমাসে 'সঙ্কর্ষণ', 'বাসুদেব' নামও দৃষ্ট হয়। এই শিলালিপির অক্ষর পরীক্ষায় প্রতীয়মান হয় যে, ইহা খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতকে খোদিত। রাজপুতনায় ঘোষুণ্ডিতে যে শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহার অক্ষর পরীক্ষায় বুঝা যায় যে, উহা অন্ততঃ খৃষ্টপূর্ব্ব দুই শত বৎসরের প্রাচীন।

দুঃখের বিষয়, শিলালিপিখানি বিকলাঙ্গ অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। উহাতে সঙ্কর্ষণ ও বাসুদেবের পূজার দালানের চারি দিকে একটী প্রাচীর নির্ম্মাণের বিষয় উল্লিখিত আছে। বেসনগরে সম্প্রতি একখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাতে যাহা খোদিত আছে, তাহার মর্ম্মার্থ এই যে, Diyar পুত্র Heliodora একজন ভাগবত বলিয়া আপনার পরিচয় দিতেন, তিনি তক্ষশিলার অধিবাসী ছিলেন, কোন রাজনৈতিক কার্য্যের ভার লইয়া যবনের রাজদূতরূপে Antalikita হইতে পূর্ব্বমালোয়ায় ভগভদ্রের নিকট গমন করিয়াছিলেন। এই ভাগবত Heliodora দেবদেব বাসুদেবের সম্মানার্থ গরুড়ধ্বজের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই লিপি খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতকের প্রারম্ভেই খোদিত হইয়াছিল। সুতরাং এই সময়ে দেবদেবরূপে বাসুদেবের উপাসনা প্রচলিত ছিল, এ কথা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারা যায়।

ক্ষত্রিয় বৃষ্ণিবংশীয় বাসুদেব ও বলদেবের কথা আমরা পুরাণাদিতে পাই। এই বলদেবের আর এক নাম সঙ্কর্ষণ। আমরা পাণিনি-সূত্রে বাসুদেবের সহিত বলদেবের এবং ঘোষুণ্ডি ও নানাঘাটের শিলালিপিদ্বয়ে বাসুদেবের সহিত সঙ্কর্ষণের নাম পাই। অধিকন্তু ঘোষুণ্ডি শিলালিপি পতঞ্জলি অপেক্ষাও প্রাচীন; সুতরাং পাণিনি-সূত্রোল্লিখিত বাসুদেব বৃষ্ণিবংশীয় বাসুদেব হইতে পৃথক্ নন।

শিলালিপি হইতে আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, অন্ততঃ খৃষ্টাব্দের ২০০ বৎসর পূর্ব্বে বাসুদেব উপাসনা প্রচলিত ছিল এবং ঐ উপাসকেরা ভাগবত বলিয়া অভিহিত হইতেন। গীতায় পুরুষ পরমেশ্বরের সঙ্কর্ষণ ও অন্যান্য ব্যূহ বা মূর্ত্তি সম্বন্ধে কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না; তবে এক স্থলে (৭।৪।৫) তাঁহার একাধিক অষ্ট প্রকৃতি সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

"ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥"

গীতোক্ত জীব—ভাগবত-পদ্ধতিতে সঙ্কর্ষণ, অহঙ্কার—অনিরুদ্ধ, এবং মন ও বুদ্ধি সম্ভবতঃ একত্র প্রদ্যুম্নে পরিণত হইয়াছে। ভাগবত একটী ধর্ম্মসম্প্রদায়রূপে পরিণত

হইবার পূর্ব্বে গীতা রচিত হয়; সুতরাং গীতোক্ত ভগবানের প্রকৃতিগুলির মধ্যে তিনটী ভাগবতমতে সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধমূর্ত্তিতে পরিণত হইয়া বাসুদেবের পরিবারভুক্ত হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। ভগবদ্গীতার পরে রচিত অনুগীতার দশম অধ্যায়ে একটী প্রাচীন আখ্যানে নারায়ণের চাতুর্হোত্রের কথা আছে। এই চাতুর্হোত্র-তত্ত্বের সহিত চতুর্ব্যূহতত্ত্বের কি কোন সম্বন্ধ আছে? অনুগীতার চাতুর্হোত্রের হোতা—আত্মা; অধ্বর্য্যু—বলির জন্য উদ্গীতব্য আত্মা; প্রশস্তার শস্ত্র—সত্য; দক্ষিণা—মুক্তি। অনুগীতা বলেন, যাহারা নারায়ণকে বুঝেন, তাঁহাদের দ্বারা ও তাঁহাদের সম্পর্কে ঋঙ্মন্ত্র উদ্গীত হইয়া থাকে। ইনিই সেই নারায়ণ, যাঁহার নিকট তাঁহারা পূর্ব্বে জীব বলি দিতেন। নারায়ণ ও বাসুদেব যে অভিন্ন, তাহা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। তাঁহারা যে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া পরিগণিত হইলেন, তৎসম্বন্ধেও কিছু আলোচনা করিয়াছি। যাদবজাতি উত্তর ও পশ্চিম-ভারতের অধিবাসী হইয়া পড়িয়াছিল। যাদববীর দেবকীপুত্র কৃষ্ণ প্রকৃত ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া, তত্ত্বদর্শিরূপে যাদবদিগের মধ্যে যশোলাভ করিয়া প্রসিদ্ধ হইলেন। যাদবেরা তাঁহাকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করিতে লাগিল। এই সময় সম্ভবতঃ বিষ্ণুর অবতাররূপে বাসুদেবের পূজা যাদবদিগের পরমধর্ম্ম হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহারা এ দিকে আবার স্বজাতিবীর শ্রীকৃষ্ণের পরম ভক্ত; এই উভয়বিধ আরাধনা পরস্পর পরস্পরের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া, কালে শ্রীকৃষ্ণ পরব্রহ্ম বিষ্ণুর অবতাররূপে সকলের শ্রদ্ধা ও পূজা পাইয়াছিলেন।

ইহার কিছু পর হইতে বিষ্ণু, নারায়ণ, বাসুদেব, কৃষ্ণ, রাম, চতুর্ব্যূহ, মৎস্যাদি অবতার সম্বন্ধে নানা তত্ত্বের আলোচনা হইতে লাগিল। পুরাণ, তন্ত্র ও আগমে সেই সমস্ত নানা প্রকারে চিত্রিত হইয়া বিবিধ প্রকারে বর্ণিত হইতে লাগিল। ইঁহাদের নানা অবস্থায় ভক্তহৃদয়ে যেমন নানাভাবের স্ফূর্ত্তি হইতে লাগিল, পুরাণাদিতেও তাঁহাদের বহুরূপ কল্পনাও চলিতে লাগিল।

শুক্রনীতি, বৃহৎসংহিতা, অগ্নিপুরাণ, চতুর্ব্বর্গচিন্তামণি, অংশুমৎতন্ত্র, পঞ্চরাত্রাগম, বৈখানসাগম প্রভৃতি গ্রন্থে বিষ্ণুমূর্ত্তির নির্ম্মাণ ও প্রকারভেদ বহুপ্রকার আলোচিত হইয়াছে। এই সকল বিষয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা সময়-সাপেক্ষ ও প্রবন্ধের কলেবর অপরিমিতভাবে বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা। বারান্তরে ঐ সকল অতি প্রয়োজনীয় অংশের আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

মহীশূরস্থ সোমনাথপুর ও বেলুড় গ্রামস্থ কেশব-মন্দিরের গাত্রে বিষ্ণুর নানা মূর্ত্তি চিত্রিত আছে। ইহাতে শিল্পের এত বৈচিত্র্য আছে যে, প্রত্যেক মূর্ত্তিকে পৃথক্‌ভাবে বর্ণনা করিলে একখানি বৃহৎ গ্রন্থ লেখা যায়। আমার প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য তাহা নয়। তবে দিগ্‌দর্শন হিসাবে দু'একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়ের আলোচনা করিলাম মাত্র। উল্লিখিত মন্দিরে বিষ্ণুর দশাবতারেরও মূর্ত্তি আছে।

দক্ষিণ-ভারতে বিষ্ণুবর্দ্ধন নৃপতি এক অপূর্ব্ব কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি পূর্ব্বে জৈন ছিলেন, পরে রামানুজ কর্তৃক বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হন এবং ১১১৭ খৃষ্টাব্দে বিষ্ণুর বিজয়নারায়ণ নামক মূর্ত্তি স্থাপন করেন। ঐ বিষ্ণুবর্দ্ধন কর্তৃক প্রবর্ত্তিত দক্ষিণ-ভারতে যে হয়সড়-স্থাপত্য সমস্ত ভারতবর্ষের স্থাপত্যকে নূতনভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল, তাহার ভাস্কর্য্যের বিশেষত্ব বিষ্ণুমূর্ত্তি লইয়া।

বেলুড়ের কেশব-মন্দিরে একটি সুন্দর লক্ষ্মীনারায়ণ-মূর্ত্তি আছে। এই মূর্ত্তির এক পার্শ্বে হনুমান্ এবং অপর পার্শ্বে গরুড়। হনুমান্ রামের ভক্ত, তাহা সর্ব্বজনবিদিত, কিন্তু বিষ্ণুমূর্ত্তিতে হনুমান্ একটি নূতন ঘটনার সূচনা করিতেছে। প্রাচীন বৈষ্ণব মতানুসারে কোথাও সীতারামের আরাধনা, কোথাও বা অন্য নামে পূজা হইত। ক্রমশঃ ঐ উপাসনা সীতারামে আরম্ভ করিয়া লক্ষ্মীনারায়ণে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। এই লক্ষ্মীনারায়ণের সহিত হনুমান্ দেখিয়া নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারা যায় যে, শিল্প-হিসাবে বিষ্ণুমূর্ত্তির উপর রামের প্রভাব হইয়া, এই নূতন স্থাপত্যের সৃষ্টি করিয়াছে। লক্ষ্মীনারায়ণের পূজা মহারাষ্ট্র ও গুর্জ্জর প্রদেশে হইয়া থাকে।

বদরীনারায়ণেও লক্ষ্মীনারায়ণের সেবা আছে। প্রাচীনতর সত্যনারায়ণ—হরিদ্বার ও কেদারনাথ হইতে যে পথ গিয়াছে, তথায় শিবের সহিত পূজাধিকার লইয়া বিবাদ করেন; শেষে শ্রীনগর হইতে বদরী পর্য্যন্ত নূতন তরঙ্গেরই প্রভাব অক্ষুণ্ণ থাকে। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলনেরও বড় একটা ব্যবস্থা হয়। ফলে কেদারনাথ ও বদরীনাথের জন্য মহান্ত বা রাউল দক্ষিণ-ভারত মান্দ্রাজ হইতে আনিবার ব্যবস্থা হয়। সেই ব্যবস্থা আজও সংরক্ষিত আছে। ইহাতে হিমাচল অঞ্চলে উত্তর-দক্ষিণের মধ্যে একটা প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে।

দ্রাবিড়দেশে অথবা গয়াধামের বেদীতে নারায়ণ এক। ইহাতে লক্ষ্মী নাই। পুরুষমূর্ত্তির সহিত স্ত্রীমূর্ত্তির প্রচার দক্ষিণ-ভারত হইতেই উত্তর-ভারতে প্রথমে হইয়াছিল বলিয়া আমার বিশ্বাস। দক্ষিণ-ভারতের পূর্ব্বে পুরুষমূর্ত্তির সহিত স্ত্রীমূর্ত্তি কোথাও ছিল না। এখনকার নারায়ণ নিশ্চয়ই বদরী বা মহারাষ্ট্রীয় নারায়ণের বহু পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত। দক্ষিণের বিষ্ণুপূজা গুপ্তযুগ হইতে চলিয়া আসিতেছে। এখনকার বিষ্ণুপূজা বৈষ্ণবধর্ম্ম নামে চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মহাভারতের আখ্যান-বস্তুগুলিকেও বেশ রসান দেওয়া হইয়াছে।

একমাত্র দক্ষিণে মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়, যেখানে কৃষ্ণমূর্ত্তি পার্থসারথিরূপে পূজিত হইয়া থাকে। অদ্যাবধি গুপ্তদিগের প্রভাব দক্ষিণে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে দক্ষিণের নারায়ণমূর্ত্তিগুলি প্রাচীন মগধের সত্যনারায়ণমূর্ত্তি। স্কন্দগুপ্ত ভিটারি-লাটের উপর ৪৮০ খৃষ্টাব্দে যে নারায়ণমূর্ত্তি স্থাপিত করিয়াছিলেন, ইহা সেই নারায়ণ-মূর্ত্তি। তিনি তাঁহার পিতৃশ্রাদ্ধ ও হূণবিজয়ের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ ইহা প্রতিষ্ঠিত করেন। এই নারায়ণমূর্ত্তিই পালরাজাদিগের সময়ে বাঙ্গালা দেশে খুব প্রচলিত ছিল।

বিষ্ণুমূর্ত্তির সঙ্গে দেবী-সংস্থানের ব্যবস্থা আছে। এই দেবী—লক্ষ্মী। ভূমি বা ভূদেবীও বিষ্ণুর পত্নী। বিষ্ণুর পত্নী লক্ষ্মীর ইঙ্গিত বেদে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে আছে,—

"যঃ পূর্ব্বায় বেধসে নবীয়সে সুমজ্জানয়ে
বিষ্ণবে দদাশতি।" ১।১৫৬।২

বিষ্ণুমূর্ত্তির সঙ্গে ভূদেবী পৃথিবীর কল্পনা বোধ হয়, বরাহ অবতার হইতে পাওয়া গিয়াছে। সাধারণতঃ শ্রী বা লক্ষ্মী তাঁহার দক্ষিণে এবং মহী, পৃথ্বী বা ভূদেবী তাঁহার বামে থাকেন। পঞ্চরাত্রাগমে নীলাদেবীর কথা লিখিত হইয়াছে। এই লক্ষ্মীর আবার নানা ভেদ আছে—অষ্ট মহালক্ষ্মী নামে আট প্রকারের লক্ষ্মী আছেন। ইঁহাদের মধ্যে গজ-লক্ষ্মী খুব প্রচলিত। 'মানসার' ইঁহার নাম দিয়াছেন—সামান্যলক্ষ্মী; শিল্পসার-প্রদত্ত নাম ইন্দ্র-লক্ষ্মী। পদ্মপুরাণে বিষ্ণুর শক্তির নাম—শ্রী, ভূ, সরস্বতী, প্রীতি, কীর্ত্তি, শান্তি, তুষ্টি ও পুষ্টি। ইঁহাদের সকলেরই চারি হাত। বিষ্ণুর অন্যান্য অবতারের সঙ্গে অপর দেবীর সংস্থানের বিধি আছে। যেমন রামের পার্শ্বে সীতা; কৃষ্ণ-দম্পতীরূপে—রুক্মিণী, সত্যভামা ও রাধা। কৃষ্ণভগিনী-সুভদ্রা—বিষ্ণুর অবতার জগন্নাথের পাশে অবস্থিত।

পুরাণ এবং সংহিতার মধ্যে বিষ্ণুর নানাবিধ মূর্ত্তিভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব—এই তিনের অন্যতম বিষ্ণুকে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের বিষ্ণু বলা যায়। বরাহ-মিহিরের বৃহৎসংহিতায় ইঁহার ত্রিবিধ মূর্ত্তির উল্লেখ আছে।—অষ্টভুজ, চতুর্ভুজ এবং দ্বিভুজ। অষ্টভুজ বিষ্ণুর প্রহরণ—শঙ্খ, চক্র, গদা, খড়্গ, শর, অভয় মুদ্রা, কার্ম্মুক, খেটক। চতুর্ভুজ বিষ্ণুর—শঙ্খ, চক্র, গদা ও অভয় মুদ্রা। দ্বিভুজ বিষ্ণুর—শঙ্খ, অভয় মুদ্রা। সাধারণতঃ আমরা বিষ্ণুকে "শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারিণং"-রূপেই বর্ণিত এবং খোদিত দেখি। কিন্তু এখানে একটী লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, বরাহমিহিরের বর্ণিত বিষ্ণুর প্রহরণের মধ্যে "পদ্ম" নাই—তৎপরিবর্ত্তে অভয় মুদ্রা রহিয়াছে। ক্যানিংহাম সাহেব কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত একটি বিষ্ণুমূর্ত্তিতে পদ্মের সংস্থান দেখা যায় না। এই মুদ্রিত মূর্ত্তিটি খৃষ্টীয় ৩য় শতকের বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। মৎস্যপুরাণেও অষ্টভুজ, চতুর্ভুজ ও দ্বিভুজ বিষ্ণুর উল্লেখ পাওয়া যায়,—

কচিদষ্টভুজং বিদ্যাচ্চতুর্ভুজমথাপরং।
দ্বিভুজশ্চাপি কর্ত্তব্যো ভবনেষু পুরোধসা॥—মৎস্যপুরাণম্।

বিষ্ণুপুরাণের বর্ণনা অনুসারে অষ্টভুজ, ষড়্ভুজ, চতুর্ভুজ ও দ্বিভুজ—এই চারি প্রকার মূর্ত্তির উল্লেখ দেখা যায়। তন্মধ্যে ষড়্ভুজের প্রহরণ—শঙ্খ, চক্র, গদা, শার্ঙ্গ, বর, অসি। ইহার মধ্যেও বিষ্ণুর হাতে পদ্মের অবস্থান দৃষ্টিগোচর হয় না। তবে পরবর্ত্তী অংশে পদ্মের উল্লেখ দেখা যায় বটে।

ইহার পরেই বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ, বিষ্ণুর এই চতুর্ব্যূহ মূর্ত্তির বর্ণনা নানাবিধ পুরাণ, তন্ত্র ও বৈষ্ণবশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। কালিকাপুরাণ,

অগ্নিপুরাণ, পদ্মপুরাণ, হেমাদ্রিধৃত সিদ্ধার্থ-সংহিতা ও বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে বাসুদেবের নানাবিধ মূর্ত্তিভেদের বর্ণনা আছে। কালিকাপুরাণে ইনি গরুড়ে সমাসীন, চতুর্ভুজ, দক্ষিণে লক্ষ্মী, বামে সরস্বতী, হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, বামকক্ষে বাণপূর্ণ তূণীর, দক্ষিণে কোষবদ্ধ খড়্গ ও শরাসন। কর্ণে কুণ্ডল, মস্তকে ও গলে আজানুলম্বিত স্বর্ণমালা, পীতবস্ত্র পরিধান। পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শুক্লবর্ণ। কালিকাপুরাণেরই অপর এক বর্ণনায় বাসুদেব কেবল নীলোৎপলদলশ্যাম ও চতুর্ভুজরূপে বর্ণিত। অগ্নিপুরাণের এক বাসুদেবের বর্ণনায় ব্রহ্মা ও শিব দুই পার্শ্বে অবস্থিত আছেন। ঐ পুরাণের অন্যবিধ বাসুদেব এইরূপ—"শ্রী-পুষ্টী চাপি কর্ত্তব্যে পদ্মবীণা-করান্বিতে" অর্থাৎ বাসুদেবের পার্শ্বে পদ্মপাণি শ্রী ও বীণাপাণি পুষ্টি থাকিবেন। ঐ পুরাণের অপর এক মূর্ত্তিতে চারি হাতের এক হাতে বরদ মুদ্রার উল্লেখ আছে। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে বাসুদেবের বর্ণন খুব প্রকাণ্ড। নূতনের মধ্যে স্ত্রীরূপধারিণী পৃথিবী এবং চামরধারিণী গদাদেবী বাসুদেবের প্রতি চাহিয়া থাকিবেন এবং পৃথিবীর করতলে বাসুদেবের চরণ দুইখানি স্থাপিত থাকিবে। ( ২ ) সঙ্কর্ষণ বাসুদেবের স্বরূপ। হেমাদ্রির ব্রতখণ্ডে ইঁহার বর্ণনা এইরূপ,—তিনি শুক্লবর্ণ, পরিধানে নীলবাস, গদা ও চক্রের পরিবর্ত্তে মুষল ও লাঙ্গল প্রহরণ। এই মুষল ও লাঙ্গল আবার "কর্ত্তব্যৌ নূরূপৌ রূপসংযুতৌ।" ( ৩ ) প্রদ্যুম্নের দ্বিবিধ মূর্ত্তি অগ্নিপুরাণে বর্ণিত আছে ;—চতুর্ভুজ আর দ্বিভুজ। চতুর্ভুজের প্রহরণ বজ্র, শঙ্খ, ধনু, গদা। দ্বিভুজের ধনু ও শর। হেমাদ্রির মতে ইনি দূর্ব্বাঙ্কুরশ্যাম এবং সিতবাসা। বৃহৎ-সংহিতার মতে প্রদ্যুম্ন চাপভৃৎ ও নিস্ত্রিংশধারিণী স্ত্রীর সহিত বর্ত্তমান। ( ৪ ) অনিরুদ্ধের মূর্ত্তি হেমাদ্রিতে এই,—পদ্মপত্রাভ বপুঃ, রক্তাম্বরধর, চক্র ও গদার পরিবর্ত্তে ইনি চর্ম্ম ও অসিধারী। অগ্নিপুরাণ, পদ্মপুরাণ ও সিদ্ধার্থ-সংহিতায় (হেমাদ্রিধৃত) বিষ্ণুর চতুর্ব্বিংশতি মূর্ত্তির বর্ণনা পাওয়া যায়। তাহা এই—কেশব, নারায়ণ, মাধব, গোবিন্দ, বিষ্ণু, মধুসূদন, ত্রিবিক্রম, বামন, শ্রীধর, হৃষীকেশ, পদ্মনাভ, দামোদর, বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, পুরুষোত্তম, অধোক্ষজ, নৃসিংহ, অচ্যুত, উপেন্দ্র, জনার্দ্দন হরি, কৃষ্ণ। এই চতুর্ব্বিংশতি মূর্ত্তির প্রত্যেকেই চতুর্ভুজ এবং প্রত্যেকেই শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী। ইঁহাদের মূর্ত্তির বিভিন্নতা বুঝিতে হইবে—বাম ও দক্ষিণহস্তের ঊর্দ্ধ অধঃক্রমে শঙ্খ-চক্রাদির অবস্থান-ভেদে। তদ্ভিন্ন এই মূর্ত্তিসমূহের মধ্যে অপর কোন পার্থক্য দেখা যায় না। এতদ্ভিন্ন বিষ্ণুর আরও কতিপয় মূর্ত্তি আছে ; তাহা এই,—( ১ ) ত্রৈলোক্যমোহন বিষ্ণু, ( ২ ) লক্ষ্মীনারায়ণ বিষ্ণু, ( ৩ ) যোগস্বামী বিষ্ণু, ( ৪ ) হরিশঙ্কর বিষ্ণু, ( ৫ ) নারায়ণ, ( ৬ ) লোকপাল বিষ্ণু। ( ১ ) ত্রৈলোক্যমোহন বিষ্ণুর আট হাত, দুই পার্শ্বে পদ্ম ও বীণাধারিণী লক্ষ্মী সরস্বতী, দক্ষিণে বিশ্বরূপ। ( ২ ) লক্ষ্মীনারায়ণ—হেমাদ্রি, পদ্মপুরাণ এবং অগ্নিপুরাণের মতে এই মূর্ত্তি ত্রিবিধ। প্রথম ইহাতে লক্ষ্মী, নারায়ণের বাম জঙ্ঘায় উপবিষ্ট হইয়া, তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া থাকিবেন। লক্ষ্মীর হাতে পদ্ম ও চামর থাকিবে।

দ্বিতীয়—ইহাতে মাত্র লক্ষ্মী বামঅঙ্কে থাকিবেন। তৃতীয়—লক্ষ্মী ও নারায়ণের মূর্ত্তি সংলগ্ন হইবে। নারায়ণের বামহস্ত লক্ষ্মীর কুক্ষিদেশে এবং লক্ষ্মীর দক্ষিণহস্ত নারায়ণের কণ্ঠলগ্ন হইবে। চামরগ্রাহিণী সিদ্ধি সমীপে থাকিবেন। বাহন নিম্নে বামভাগে। সম্মুখে শঙ্খচক্রধারী দুইজন বামন পুরুষ থাকিবেন। ব্রহ্মা এবং শিব উপাসকভাবে নিকটে থাকিবেন। (৩) যোগস্বামী—ইনি চতুর্ব্বাহু, অল্প মীলিতলোচনে পদ্মাসন করিয়া শ্বেতপদ্মের উপর আসীন। শঙ্খ-চক্র-গদা-প ধারী। (৪) হরিশঙ্কর—ইনি বিংশবাহু, চতুর্ম্মুখ, ত্রিনেত্র, বামপার্শ্বে জলশায়ী, লক্ষ্মী কর্ত্তৃক একটি চরণ ধৃত এবং বিমলাদি কর্ত্তৃক স্তুত। (৫) নারায়ণ—পদ্মাসীন, দক্ষিণে লক্ষ্মী বসুপাত্র, স্বর্ণপদ্ম ও মাতুলুঙ্গ ধারণ করিয়া থাকিবেন, বামে পৃথিবী ধান্যপাত্র ও রক্তোৎপল ধরিয়া থাকিবেন। বিমলাদি শক্তিগণ চামর ধরিয়া থাকিবেন। (৬) লোকপাল—ইনি "একবক্ত্রো দ্বিবাহুশ্চ গদাচক্রধরঃ প্রভুঃ।"

পুরাণে বিষ্ণুর অবতারের কথা আছে।* প্রথম প্রথম বিষ্ণুর অবতার অসংখ্য বলিয়াই কল্পিত হইত। তার পর ক্রমে সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট করিবার প্রচেষ্টা হইতে লাগিল। হরিবংশে (১ম অধ্যায়, ৪২ প্রভৃতি শ্লোক) আটটী অবতারের নাম পাওয়া যায়,—বরাহ, নৃসিংহ, বামন, দত্তাত্রেয়, জামদগ্ন্য (পরশুরাম), রাম, কৃষ্ণ ও কল্কি। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে (১) হংস, (২) কূর্ম্ম, (৩) মৎস্য, (৪) বরাহ, (৫) বামন, (৬) পরশু (রাম), (৭) রাম দাশরথি, (৮) সাত্বত (কৃষ্ণ) ও কল্কি, এই নয়টী অবতারের নাম আছে। দেবীপুরাণে (১অঃ, ৫ শ্লোক) বলা হইয়াছে যে, বিষ্ণুর অবতার ৬০টী। ভাগবত-পুরাণ (১।৩।১ ইত্যাদি) বিষ্ণুর অবতার অসংখ্য বলিয়া, পরে ২২টী অবতারের উল্লেখ করিয়াছেন; ২২টী অবতারের নাম, যথা—

| | |
|---|---|
| ১। পুরুষ | ১১। কূর্ম্ম |
| ২। বরাহ | ১২। ১৩—ধন্বন্তরি |
| ৩। নারদ | ১৪। নরসিংহ |
| ৪। নর অথবা নারায়ণ | ১৫। বামন |
| ৫। কপিল | ১৬। পরশুরাম |
| ৬। দত্তাত্রেয় | ১৭। বেদব্যাস |
| ৭। যজ্ঞ, যজ্ঞমূর্ত্তি অথবা যজ্ঞেশ | ১৮। রাম |
| ৮। ঋষভ | ১৯। ২০—বলরাম ও কৃষ্ণ |
| ৯। পৃথু | ২১। বুদ্ধ |
| ১০। মৎস্য | ২২। কল্কি |

* প্রথম প্রথম "অবতার" শব্দের প্রয়োগ ছিল না। অবতারকে "প্রাদুর্ভব" বলা হইত। হরিবংশে, মহাভারতে প্রাদুর্ভব শব্দ আছে। হরিবংশ "দশপ্রাদুর্ভবাঃ" স্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু নাম করিবার সময় ৮টীর বেশী নাম করেন নাই।

ভক্তমাল ২৫টী এবং পঞ্চরাত্র ৩৯টী অবতারের কথা বলিয়াছেন। আমরা সাধারণতঃ মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ ও কল্কি—এই দশটীকে বিষ্ণুর দশাবতার বলিয়া থাকি। কিন্তু পুরাণাদিতে দশাবতারের মধ্যে ঠিক এই কয়টী নাম পাওয়া যায় না। ক্ষেমেন্দ্রের অবদানকল্পলতায় সর্ব্বপ্রথম দশাবতারের মধ্যে এই দশটী নাম পাওয়া যায়। অতঃপর কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দে পুনরায় এই নাম দশটী দেখিতে পাই। দশাবতারের তালিকায় এই দশটী নাম কেমন করিয়া কখন্ প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা পণ্ডিতমণ্ডলীর অনুসন্ধেয়। যাহা হউক, স্থাপত্যে আমরা দশাবতারের বহু প্রকার মূর্ত্তি যথেষ্টই দেখিতে পাই। সেগুলির সম্পূর্ণ তালিকা দিতে চেষ্টা না করিয়া, সাধারণ মূর্ত্তিগুলির একটী তালিকা দেওয়া হইল,—

**অবতার—**

১। মৎস্য—
  (ক) হয়গ্রীব

২। কূর্ম্ম—

৩। বরাহ—
  (ক) যজ্ঞ-বরাহ
  (খ) ভূ-বরাহ
  (গ) আদি-বরাহ
  (ঘ) প্রলয়-বরাহ

৪। নরসিংহ—
  (ক) উগ্র-নরসিংহ
  (খ) লক্ষ্মী-নরসিংহ
  (গ) যোগ-নরসিংহ
  (ঘ) কেবল-নরসিংহ
  (ঙ) গিরিজা-নরসিংহ
  (চ) স্থৌন-নরসিংহ
  (ছ) যানক-নরসিংহ

৫। **বামন—**
  (ক) ত্রিবিক্রম

৬। পরশুরাম—
  জামদগ্ন্য রাম

৭। রাম—
  (ক) রামচন্দ্র, রামভদ্র বা রাঘব রাম
  (খ) বলভদ্র রাম

৮। কৃষ্ণ-রুক্মিণী—
  (ক) গোপাল
  (খ) নবনীত নৃত্যমূর্ত্তি বা বালকৃষ্ণ নবনীত-নট
  (গ) সন্তান-গোপাল
  (ঘ) বটপত্রশায়ী
  (ঙ) কালীয়-কৃষ্ণ
  (চ) কালীয়াদিমর্দ্দক
  (ছ) বেণু-গোপাল
  (জ) গান-গোপাল
  (ঝ) মদন-গোপাল
  (ঞ) গোবর্দ্ধন-কৃষ্ণ
  (ট) গোবর্দ্ধনধর
  (ঠ) গোপীবস্ত্রাপহারক
  (ড) পার্থ-সারথি
  (ঢ) রাধাকৃষ্ণ

৯। বুদ্ধ—

১০। কল্কি —

আসনাদি অনুসারে বিষ্ণুমূর্ত্তির নামভেদও হইয়া থাকে। আসন অনুসারে বিষ্ণুর কিরূপ নাম-ভেদ হয়, তাহার কয়েকটী দৃষ্টান্ত নিম্নে প্রদত্ত হইল —

বিষ্ণু—( চতুর্ভুজ ও অষ্টভুজ )

মধ্যমযোগস্থানকমূর্ত্তি
ভোগস্থানক মূর্ত্তি
অধম „
বীরস্থানকমূর্ত্তি
অভিচারিকাস্থানকমূর্ত্তি
স্থানকমূর্ত্তি
মধ্যমভোগস্থানকমূর্ত্তি
যোগস্থানকমূর্ত্তি
ভোগাসনমূর্ত্তি
মধ্যমভোগাসনমূর্ত্তি
অধমবীরাসনমূর্ত্তি
বীরাসনমূর্ত্তি
অভিচারিকাসনমূর্ত্তি
যোগশয়ানমূর্ত্তি
মধ্যমযোগশয়ানমূর্ত্তি
ভোগশয়ানমূর্ত্তি
উত্তমভোগশয়ানমূর্ত্তি
বীরশয়ানমূর্ত্তি
অভিচারিকাশয়ানমূর্ত্তি

এছাড়া বিষ্ণুর অন্যান্য মূর্ত্তিরও কয়েকটী উদাহরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

## বিষ্ণুর অন্যান্য মূর্ত্তি

১। অনন্তশায়ী
২। বৈকুণ্ঠ-নারায়ণ (বৈকুণ্ঠ বা বৈকুণ্ঠনাথ)
৩। লক্ষ্মীনারায়ণ
৪। আদিমূর্ত্তি
৫। জলশায়ী
৬। কবিবরদ
৭। বরদরাজ
৮। বিট্ ঠল
৯। জগন্নাথ
১০। রতি-মন্মথ
১১। গরুড-নারায়ণ
১২। ঐ এবং গজেন্দ্রমোক্ষ
১৩। যোগেশ্বর-বিষ্ণু
১৪। পাণ্ডুরঙ্গ বা বিঠোবা
১৫। গরুড়
১৬। পদ্মনাভ অথবা রঙ্গনাথ
১৭। দত্তাত্রেয়
১৮। হরিহর পিতামহ
১৯। ত্রৈলোক্যমোহন
২০। বিশ্বরূপ
২১। ধর্ম্ম
২২। বেঙ্কটেশ
২৩। হরিকৃষ্ণঃ

বিষ্ণুর গরুড়ধ্বজের উল্লেখ দেবীপুরাণের চতুর্থ অধ্যায়ের ৪৮ শ্লোকে দেখিতে পাওয়া যায়। কয়েকজন ইয়ুরোপীয় পণ্ডিত গরুড়ধ্বজের ব্যাপারটী গ্রীক ভাগবত Diya বা

Heliodora সম্পর্কে সূচিত বলিয়া মনে করেন। দেবীপুরাণে আছে, ঘোর দৈত্য বিষ্ণুকে খড়্গ, চক্র ও গদাধারী বলিয়া স্তব করিয়াছিলেন। আর একবার তিনি স্তবে বিষ্ণুকে শঙ্খ, চক্র, গদা, খড়্গধারী বলিয়াছেন। এই উভয় স্তবে দেখা যাইতেছে যে, বিষ্ণুর হস্তে পদ্ম নাই। প্রথম স্তবে শঙ্খও নাই। বিষ্ণুর হস্তে যে পদ্ম থাকিতেই হইবে, এমন কোন নিয়ম নাই। তবে তাঁহার বক্ষঃস্থল কৌস্তুভ-শোভিত হওয়া চাই। সকল বিষ্ণুমূর্ত্তিতেই তাহা থাকিবে। কেবল বঙ্গদেশের বিষ্ণুমূর্ত্তিতে কৌস্তুভচিহ্ন প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। বিষ্ণুমূর্ত্তির বক্ষে বা হস্তে শ্রীবৎসলাঞ্ছন থাকিতেও পারে, নাও পারে। শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় (বঙ্গদর্শন, ১৩১০, পৃঃ ৬৫, ৬৬) মনে করেন যে, বিষ্ণুর পূর্ব্বে গদা ছিল না। বিষ্ণু সম্ভবতঃ বৈদিক পূষার গদাটী কাড়িয়া রাখিয়াছিলেন। চক্রটী বিষ্ণুর পৈতৃক সম্পত্তি, এবং তাহা নিশ্চয়ই আদিত্যের চক্র। তিনি আরও বলেন যে, বিষ্ণু যে পদ্মপাণির পদ্মটী হাতে করিয়া উপস্থিত, তাহা তাঁহার শান্তিময় স্বরূপ-বর্ণনা হইতেও কতকটা বুঝিতে পারা যায়। এগুলি সম্বন্ধে কোনও সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে আমাদের উপযুক্ত উপাদান সংগ্রহ করা আবশ্যক। এ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত উপাদান যথেষ্ট নহে। বৌদ্ধদিগের মধ্যেও বিষ্ণু স্থান পাইয়াছেন। তবে বিষ্ণুর স্থান তাঁহারা উচ্চ করেন নাই। সদ্ধর্ম্মপুণ্ডরীকে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বৌদ্ধেরা বুদ্ধের চারি পাশের দেবতাদের মধ্যে বিষ্ণুকে ধরেন নাই। কোন কোন বৌদ্ধগ্রন্থে বিষ্ণুর (কেয়ুরে) উল্লেখ আছে। জৈনসূত্রভূমিকায়, (S. B. E. Vol. 22) বিষ্ণুর অবতার সম্বন্ধে আলোচনা আছে। (৫৩৭ সংখ্যক জাতক) সুতসোমজাতকে অমোঘসিদ্ধি ও বিষ্ণু অভিন্ন বলা হইয়াছে। সুতসোম গৌতমের কোন পূর্ব্বজন্মের নাম। যবদ্বীপে এই জাতকের অনুরূপ কাহিনী। যবদ্বীপবাসীরা বলে, বুদ্ধ—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও ঈশ্বর। আর সুতসোম সেই বুদ্ধের অবতার। ব্যাঙ্‌ককেও বিষ্ণুমূর্ত্তির পূজা হইয়া থাকে। এই স্থানের রাজকীয় মন্দিরগুলিতে রামায়ণের বহু র্ত্তি ও চিত্র আছে। এখানে গরুড়ারূঢ় "নরৈ" বা নারায়ণ-বিষ্ণুর একটী মূর্ত্তি আছে। যবদ্বীপে বোরোবদর হইতে অল্পদূরে "প্রম্বনম্" মন্দিরমালা অবস্থিত। এখানে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও নন্দীর স্বতন্ত্র চারিটী মন্দির আছে। বিষ্ণুর পূজা হয় না। তবে শিল্পে গরুড়ারূঢ় বিষ্ণুমূর্ত্তির সংখ্যা বড় কম নয়।

বলিদ্বীপে আমাদের যেমন হরি-হর মূর্ত্তি আছে, যবদ্বীপে তেমনই বিষ্ণু-বুদ্ধমূর্ত্তি আছে। এখানে শিবের স্থান সর্ব্বোচ্চ—তাহার পর বিষ্ণুর স্থান। এইখানের "কমহাযানিকন" নামক একাদশ শতকের মহাযানিক গ্রন্থেও বিষ্ণু-বুদ্ধের কথা আছে।

চম্পার লোকেরা শৈব। তবে সেখানেও বিষ্ণুপূজার যে প্রভাব ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ৮১১ খৃষ্টাব্দের একটী শিলালিপিতে (Corpus II, pp. 229, 230) শঙ্করনারায়ণের মূর্ত্তির উল্লেখ আছে। এখানে গোবর্দ্ধনধারী নারায়ণের একটী মূর্ত্তি আছে। ১১৫৭ খৃষ্টাব্দের একখানি লিপিতে রাম ও কৃষ্ণের নাম পাওয়া যায়। ইহাতে

ক্ষোদিত আছে যে, প্রথম জয়হরিবর্ম্মরাজ বিষ্ণুর অবতার ( B. E. F. E. O., 1904, pp. 959, 960 )। গরুড়বাহন বিষ্ণুমূর্ত্তি এখানে অতি অল্পই আছে ( B. E. F. E. O., p. 1901, p. 18 )। সিংহলের অধিবাসীর প্রায় চতুর্থাংশ হিন্দু তামিল। উত্তরাঞ্চলে দ্রাবিড়-রীতিতে নির্ম্মিত অনেকগুলি হিন্দু-মন্দির আছে। এখানকার বৌদ্ধ-মন্দিরেও হিন্দুদেবতা স্থান পাইয়াছেন। এই সমস্ত মন্দিরের মধ্যে দক্ষিণদিকের শ্রেণীতে প্রায়ই বুদ্ধমূর্ত্তি থাকে এবং বামদিকের শ্রেণীতে মহাব্রহ্মা, বিষ্ণু, কার্ত্তিকেয় ও মহাসামনের মূর্ত্তি থাকে। তন্মধ্যে বিষ্ণুমূর্ত্তির বিশেষ পূজা ও সম্মান করা হয়। এইখানকার বৌদ্ধেরা বিশ্বাস করে যে, বিষ্ণু বুদ্ধের সম্মান করিয়া থাকেন ( Ceylon, Ant. July, 1916 )। সম্প্রতি অনগারিক ধর্ম্মপাল-প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধবিহারেও একটী সুন্দর বিষ্ণুমূর্ত্তি স্থান পাইয়াছে।

তিব্বতে হয়গ্রীবকে বিষ্ণুর সহিত অভিন্ন বলিয়া কল্পনা করা হয় ( Journal ( Bxddhist text society, Voll. II, pt. II, Appendix II. p. 6, 1904 )। এইরূপে দেখা যাইতেছে যে, ভারতের বাহিরেও এক সময়ে বিষ্ণুর যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। *

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

---

* উপসংহারে বক্তব্য যে, প্রবন্ধে উল্লিখিত গ্রন্থাদি ব্যতীত যে সমস্ত পুস্তক হইতে বা যাঁহাদের নিকট সাহায্য লইয়াছি, সেই সমস্ত গ্রন্থ ও ব্যক্তির নাম নিম্নে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি,—

১। R. G. Bhandarkar—Vaishnavism, Saivism &c.

২। Binodebihari Kavyatirtha—Varieties of Vishnu Image.

৩। Sir Charles Eliot—Hinduism & Buddhism.

৪। শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় সরস্বতী, বি ই।

৫। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য।

# মহাদেব*

রবিবার দিন শ্রীমান্ বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য ব্রহ্মার সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন, মঙ্গলবার দিন শ্রীমান্ অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ বিষ্ণু সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন; আজ বৃহস্পতিবার—আমার পালা। শেষ পালা, মধুরেণ সমাপয়েৎ—শিবের পালা। বিনয় ও অমূল্যর কাজ একটু সোজা—কারণ, বেদে ব্রহ্মাও আছেন, বিষ্ণুও আছেন। আমার পালা কঠিন—কারণ, শিব বেদে নাই, অথচ এখনকার ত্রিমূর্ত্তির মধ্যে তিনি একজন প্রধান। শিব বড়, কি বিষ্ণু বড়, এ বিষয়ে অনেক ঝগড়া আছে। সে ঝগড়ায় মাথা দিবার আমার দরকার নাই, তবে তারা দু'জনাই যে ব্রহ্মার চাইতেও বড়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই—কারণ, ব্রহ্মার পূজা বড় একটা নাই।

আমাদের ত্রিমূর্ত্তি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব। ব্রহ্মার লোক আছে, ভুবন আছে; বিষ্ণুরও লোক আছে, ভুবন আছে। ব্রহ্মার ভুবন ব্রহ্মলোক, বিষ্ণুর ভুবন বিষ্ণুলোক—গোলোক বা বৈকুণ্ঠ। ব্রহ্মার দাস আছে, দাসী আছে, অনুচর আছে, অট্টালিকা আছে, উদ্যান আছে। বিষ্ণুরও দাস আছে, দাসী আছে, অনুচর আছে, অট্টালিকা, উদ্যান—সবই আছে। শিবের কিছুই নাই, তিনি থাকেন পরের দেশে, কুবের কৈলাসের অধিপতি—তিনি কৈলাসের বাহিরে একটা বাগানে পড়ে' থাকেন। তাঁহার বাড়ী নাই, ঘর নাই—প্রায়ই ঘুরে বেড়ান—প্রায়ই থাকেন শ্মশানে-মশানে। ব্রহ্মার বেশও আছে, ভূষা আছে; বিষ্ণুরও বেশ আছে, ভূষা আছে, শিবের কিছুই নাই—আছে কেবল বাঘের ছাল। কোন সময়ে তাহাও থাকে না—তিনি দিক্‌গুলি জড়িয়ে কাপড় বলিয়া পরেন, অর্থাৎ দিগম্বর বা নেংটা থাকেন। দেবতা হ'বার যা-কিছু আনুষঙ্গিক, তা সবই ব্রহ্মারও আছে, বিষ্ণুরও আছে। শিবের নাই, অথচ শিব ত্রিমূর্ত্তির এক মূর্ত্তি। এর মানে কি?

বেদে অনেক দেবতা আছেন। অগ্নি আছেন, ইন্দ্র আছেন, বায়ু আছেন, বরুণ আছেন, সূর্য্য আছেন, সবিতা আছেন, ভগ আছেন, পূষা আছেন, অর্য্যমা আছেন, কিন্তু শিব নাই। যজ্ঞে সব দেবতার ভাগ আছে, শিবের নাই। শিব তা হইলে এলেন কোথা থেকে?

এখনকার পণ্ডিতেরা বলেন, শিব রুদ্র। ঋগ্বেদে কিন্তু রুদ্র শব্দ বহুবচনে ব্যবহার হয়, অর্থাৎ রুদ্রেরা একটা গণ। অমরকোষ বলেন, "রুদ্রাশ্চ গণদেবতাঃ।" চীৎকার করিয়া আকাশে ঘুরিয়া বেড়ান বলিয়া তাঁহাদের নাম হইয়াছে রুদ্র। তাঁরা দল বাঁধিয়া বেড়ান। তাঁহাদের মনিব ইন্দ্র। ইন্দ্র তাঁহাদের বড় ভালবাসেন। আর একটা

* ১৩২৮ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চতুর্দ্দশ বিশেষ অধিবেশনে পঠিত।

গণ—সেও ইন্দ্রের। তার নাম মরুৎগণ। তারাও অন্তরীক্ষে ঘুরিয়া বেড়ায়। সকলেই মনে করে, রুদ্রগণ ও মরুৎগণ এক। ঝড়-বৃষ্টি হইলেই সঙ্গে সঙ্গে বজ্র ও বিদ্যুৎ থাকে। ঝড়-বৃষ্টির দেবতা হলেন রুদ্রগণ। সুতরাং উভয়েই এক।

ঋগ্বেদে একবচনেও রুদ্র আছে। তিনি এই রুদ্রদের পিতা এবং পৃশ্নি বা পৃথিবী তাহাদের মাতা; কিন্তু অন্যান্য জায়গায় রুদ্রদিগের উৎপত্তি অন্যরূপে বর্ণিত আছে। রুদ্র ও মরুৎগণ হইতেই বোধ হয়, অতি প্রাচীনকালে রুদ্রের উৎপত্তি হইয়াছে। মরুৎগণ ও রুদ্রগণ গণদেবতা ছিলেন, কিন্তু তাঁদের ত একজন কর্ত্তা থাকা চাই—সেই কর্ত্তাই রুদ্র। বৈদিক ঋষিরা রুদ্রের ভয়েই অস্থির। তাঁহাদের কেবল কথা—ওগো, আমাদের মেরো না, আমাদের মেরো না; ছেলে মেরো না, গরু মেরো না, বাছুর মেরো না, পশু মেরো না। তোমাদের হাতের অস্ত্র-শস্ত্রগুলি আমাদিগের দিকে ছুড় না—অন্য দিকে ছোড়। রুদ্র খুসী হইলে ভালও করিতে পারেন, অনেক সময় ব্যারাম আরাম করিয়া দিতেও পারেন। ঋগ্বেদে বহুবচনে রুদ্রই বেশী; একবচনে তিনটি মাত্র সূক্ত আছে। যজুর্ব্বেদে এ সব শাখারই একটি করিয়া রুদ্রাধ্যায় বা শতরুদ্রীয় আছে। অমঙ্গল নিবারণের জন্য বাঙ্গালা ভিন্ন সর্ব্বত্রই রুদ্রাধ্যায় পঠিত হয়। সব ব্রাহ্মণ যজুর্ব্বেদের অন্য অংশ মুখস্থ করুন আর না করুন, রুদ্রাধ্যায়টি মুখস্থ করেন। এই রুদ্র আমাদের শিব হইতে পারেন না। কারণ, আমাদের শিব যদিও সংহারের দেবতা বটেন, তথাপি তিনি নিরন্তর লোকের অমঙ্গল করিয়া বেড়ান না। সুতরাং যজুর্ব্বেদের রুদ্র আমাদের শিব হওয়া বড়ই কঠিন। সামবেদীয় সন্ধ্যায় আমরা এক রুদ্রের কথা পাই, তাহার মন্ত্র এই,—

"ঋতং সত্যং পরং ব্রহ্ম পুরুষং কৃষ্ণপিঙ্গলং।
ঊর্দ্ধলিঙ্গং বিরূপাক্ষং বিশ্বরূপং নমো নমঃ।

আমাদের শিব দেখুন,—

"ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং
রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং পরশুমৃগবরাভীতিহস্তং প্রসন্নং।
পদ্মাসীনং সমন্তাৎ স্তুতমমরগণৈঃ ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানং
বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রম্॥"

প্রথমতঃ রঙ্গেই তফাৎ। রুদ্র হইলেন কৃষ্ণ-পিঙ্গল; শিব হইলেন—রজতগিরিনিভ। আমাদের শিব পঞ্চবক্ত্র—রুদ্র পঞ্চবক্ত্র নহেন, রুদ্র ঊর্দ্ধলিঙ্গ—আমাদের শিব তাহা নহেন, সুতরাং রুদ্র শিব হইতে পারিলেন না। আমাদের শিবের পূজা করিতে গেলে অষ্টমূর্ত্তির পূজা করিতে হয়। রুদ্রের পূজায় অষ্টমূর্ত্তি নাই। সুতরাং রুদ্র ও শিব এক হইতে পারেন না। ঋগ্বেদে শিব শব্দ অনেক জায়গায় আছে বটে, কিন্তু সব জায়গায় বিশেষণ—বিশেষ্য নহে। যজুর্ব্বেদ সামবেদেও তাই। ঋগ্বেদে মহাদেব শব্দ একেবারেই নাই। মহাদেব যে দু'টি নামে আমাদের নিকট পরিচিত, সে দু'টির একটিও নাই।

শিবও নাই—শম্ভুও নাই, তবেএ শিবই বা কে, মহাদেবই বা কে, শম্ভুই বা কে? অথর্ব্ববেদে একটি অধ্যায় আছে, সেটির সংখ্যা ১৫; সেটিকে যেই পড়ে, সেই বলে, অর্থ বুঝিতে পারিলাম না। ইহা একটি কোন রহস্যময় পদার্থ,—চারিদিকে পদ্য, কিন্তু এ অধ্যায়টি গদ্য; চারিদিকে অতি প্রাচীন বৈদিক ভাষা, কিন্তু এটি যেন সংস্কৃত ভাষা। চারিদিকে মন্ত্র, যাদুবিদ্যা, ঝাড়-ফুকের মন্ত্র, মধ্যে বেশ একটু যোরাল কবিকল্পনা; চারিদিকে সমস্তই অতি প্রাচীন পদার্থ, মধ্যে একটু নূতন জিনিস। চারিদিকে যজ্ঞের আয়োজন, মধ্যে বেশ একটু স্ফূর্ত্তির কল্পনা। যেই পড়ে, সেই মুগ্ধ হয়—আশ্চর্য্য হয়, কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারে না। সব অধ্যায়টিই ব্রাত্যকে বাড়াইবার জন্য লেখা হইয়াছে। কিন্তু ব্রাত্য বলিতে কি বুঝায়? মনু বলিয়াছেন, "সাবিত্রী-পতিতা ব্রাত্যাঃ।" আর্য্যদের মধ্যে যদি কেহ সাবিত্রী হইতে পতিত হন, তিনিই ব্রাত্য। কিন্তু এখানে ব্রাত্য বলিতে তাহা বুঝায় না; যদি তাহাই বুঝাইত, তাহা হইলে, মানেটা আরও জটিল হইয়া যাইত। যে পতিত, তাহাকে আবার বাড়ান? কোন যেমন তেমন বাড়ান নহে—আকাশ পাতাল বাড়ান। সুতরাং ব্রাত্য শব্দের মানে খুঁজিতে হইল; দেখিলাম, ব্রত পতিত হইলে ব্রাত্য হয় না। পতিত অর্থে শব্দের উত্তর তদ্ধিত-প্রত্যয় হয় না। ঋগ্বেদে দেখিলাম, ব্রাত শব্দ আট বার ব্যবহার আছে। ব্রাত বলিতে দল বুঝায়। যে দলের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট নাই, তাহাকেই ব্রাত বলে। ব্রাতরা ঋষিদের শত্রু ছিলেন। ঋষিদের অনেক সময় ব্রাতদিগের সহিত লড়াই করিতে হইত। এক জায়গায় আছে যে, ঋষিরা দেবতাদের কাছে এমন রথ প্রার্থনা করিতেছেন, যেন, তাঁহারা ব্রাতদের আক্রমণ সহ্য করিতে পারেন। সুতরাং ব্রাত বলিতে ঋষিদের বিরুদ্ধ কোন যাযাবর জাতি বুঝাইত। ইহাদের কোন নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান ছিল না; দু'চার দিন কোথাও বাস করিত, তাহার পর উঠিয়া যাইত। দু'চারি দিন যেখানে বাস করিত, তাহার নাম ব্রাত্যা। সামবেদের পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণের ১৭শ অধ্যায়ে ব্রাত্যা শব্দ আছে। ব্রাত্যেরা ব্রাত্যায় থাকিত। তাহারা ব্রহ্মচর্য্য করিত না, কৃষি করিত না, বাণিজ্য করিত না। করিত কি?—পশুপালন। ঋষিদের মতন তাহাদের ধনুকও ছিল না, বাণও ছিল না, কিন্তু ইহাদের বাঁক ছিল; ধনুকের "জ্যা" ছিল না, এমন এক ধনুক ছিল; তীর ছিল না, বাঁকের বাড়ি মারিত। ঋষিদের ভাল ভাল রথ ছিল,—ব্রাত্যদের গরুর গাড়ী ছিল। ঋষিদের চাবুক ছিল,—ওদের পাচনবাড়ী ছিল। ঋষিদের ঘোড়া খুব সায়েস্তা ছিল,—এদের ঘোড়া একবার এদিকে যাইত, এক বার ওদিকে যাইত। ঋষিদের রথের তক্তা আটা থাকিত,—ইহাদের গরুর-গাড়ীতে তক্তা বিছান থাকিত।। উহারা তেরচা কুরিয়া টুপি মাথায় দিত, কোমরে দুইগাছা দড়ি দিয়া কাপড় বাঁধিয়া রাখিত। তাহারা কালাপেড়ে কাপড় পরিত, চামড়া দেওয়া খড়ম পরিত।

এই ত গেল ব্রাত্যদের কথা। ইহাদের বাড়াইবার জন্যই কি অথর্ব্ববেদের ১৫শ

অধ্যায় লেখা হইয়াছিল ? সে কথার বিচারের পূর্ব্বে দেখা যাউক, ব্রাত্যরা কোন্ বংশ ? পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণে বলে, ব্রাত্যেরাও ঋষিদের মতন দৈব প্রজা, অর্থাৎ দেবতাদিগের উপাসক। তবে তাহাদের দেবতারা স্বর্গে গিয়াছিলেন, উহারা দেবতাদের খুজিয়া পাইত না; চারিদিকে খুজিয়া বেড়াইত—পাইত না। মরুৎ-দেবতারা তাহাদিগকে কতকগুলি সামগান শিখাইয়া দিয়াছিল, সেই গান করিলে, তাহারা দেবতাদের খুজিয়া পাইত। সেই গানগুলির নাম ব্রাত্যস্তোম। যে যজ্ঞে ব্রাত্যস্তোম হইত, তাহার নামও ব্রাত্যস্তোম। অন্য অন্য যজ্ঞে ঋত্বিক্ ছাড়া একজন মাত্র যজমান থাকে, দু'জন যজমানের কথা বড় দেখা যায় না, কিন্তু ব্রাত্যস্তোমে যজমান হাজার হাজার হইতে পারে। আর সকলেই ব্রাত্যস্তোম করিয়া পবিত্র হইয়া যাইত ও ঋষিদের সঙ্গে সমান হইয়া যাইত। ব্রাত্য-স্তোমের পর ঋষিরা ব্রাত্যদিগের সঙ্গে একত্রে খাইতেন, তাহাদের হাতের রান্না খাইতেন, তাহাদিগকে বেদ পড়িতে দিতেন,—তিন বেদই পড়িতে দিতেন, তাহাদের ঋত্বিক্ হইতে দিতেন; মোটামুটি তাহাদিগকে আপনাদের সমান করিয়া লইতেন। কিন্তু তাহাদের ব্রাত্য অবস্থার কোন সম্পত্তি আনিতে দিতেন না। তাহারা সেগুলি হয় ব্রাত্যদের দান করিত, না হয় মগধদেশের ব্রাহ্মণদের দান করিয়া আসিত। এই সকল দেখিয়া মনে হয়, তাহারা আর্য্যবংশীয় ছিল, যতক্ষণ যাবাবর থাকিত, ততক্ষণ ঋষিরা তাহাদের সঙ্গে আহার-ব্যবহার করিতেন না; ব্রাত্যস্তোম করিয়া কোন স্থানে স্থায়িভাবে বাস করিলে, তাহাদিগকে আপনাদের সমান করিয়া লইতেন। তখন তাহারা সামগান রচনা করিত, মন্ত্রদর্শন করিত —এমন কি, বেদের শাখাও সংগ্রহ করিত। তাহারা ঋষিদের সমাজে নবজীবন সঞ্চার করিয়া দিত; ঋষিরা যে স্থানে বাস করিতেন, সে স্থানের নাম ছিল অন্তর্দ্দেশ। ব্রাত্যেরা অন্তর্দ্দেশেও থাকিত, বাহিরেও থাকিত। অন্তর্দ্দেশ গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী স্থান, গঙ্গা-যমুনার অপর পারেও খানিকটা ছিল। ব্রাত্যেরা অন্তর্দ্দেশেও ঘুরিয়া বেড়াইত, আর উহার চারিদিকেও ঘুরিয়া বেড়াইত।

আমরা পূর্ব্বে জানিতাম যে, পতিত না হইলে ব্রাত্য হয় না। কিন্তু এখন দেখিতেছি, ব্রাত্য ও ঋষিরা একবংশীয়। ব্রাত্যেরা যাযাবর এবং ঋষিরা স্থায়ী। ব্রাত্যেরা স্থায়ী হইলে ঋষিদের সমান হইত। এত দিন ব্রাত্যশব্দের এই অর্থ বুঝা যায় নাই বলিয়া, অথর্ব্ববেদের ১৫ সংখ্যক অধ্যায়টী ভাল বুঝা যায় নাই। অথর্ব্ববেদের এই অধ্যায়টী ব্রাত্যদিগের প্রশংসাই বটে। কিন্তু সে যে-সে ব্রাত্য নহে। ব্রাত্যেরা প্রজাপতির নিকট গিয়া বলিলেন, আপনি আপনার ভিতরে লক্ষ্য করিয়া দেখুন। প্রজাপতি দেখিলেন, একটা আলো,—একটা "সু" বর্ণ রহিয়াছে। সে আলো তিনি জন্মাইয়া দিলেন, অর্থাৎ আপনার শরীর হইতে বাহির করিয়া দিলেন। সে এক হইল, শ্রেষ্ঠ হইল, মহৎ হইল, ব্রহ্মা হইল, সে তপ হইল, সে সত্য হইল, সে বাড়িতে লাগিল, সে "মহাদেব" হইল, সে দেবগণের কর্তৃত্ব পাইল, সে ঈশান হইল, সে একব্রাত্য হইল। অর্থাৎ ব্রাত্যগণের দেবতা হইলেন। ব্রাত্যগণ যেন সব

এক হইয়া দেবতারূপে আবির্ভাব হইল। ইন্দ্রধনু উহার ধনু হইল; কারণ, ইন্দ্রধনুর ছিলা নাই, সুতরাং সে ব্রাত্যদিগের ঠিক ধনু হইল। সেই ধনুর উদর নীল, পৃষ্ঠ লোহিত। নীল অংশের দ্বারা উহারা শত্রুদিগকে অভিভূত করে এবং লোহিত অংশের দ্বারা শত্রুদিগকে বিদ্ধ করে।

সুতরাং এই অধ্যায়ে ব্রাত্যকে বাড়ান হইল না, ব্রাত্যের দেবতাকেই বাড়ান হইল। সেই দেবতাই আমাদের শিব। তিনি মহাদেব; তিনিই ঈশান। মহাদেব শব্দ ঋগ্বেদে নাই, যজুর্ব্বেদে নাই; সামবেদে আছে—কিন্তু সেখানেও নাম বলিয়া বোধ হয় না; একটা বিশেষণ বলিয়া বোধ হয়। ইনি যে শিব, ইহার আরও প্রমাণ পাওয়া যায়। ইনি পূর্ব্বদিকে চলিলেন, কতকগুলি সাম, কতকগুলি দেবতা সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। শ্রদ্ধা তাঁহার প্রিয়তমা, মাগধ তাঁহার পরামর্শদাতা হইল, বিজ্ঞান তাঁহার কাপড় হইল, দিন উষ্ণীষ হইল; রাত্রি কেশ হইল ইত্যাদি ইত্যাদি। এইরূপে তিনি দক্ষিণদিকে চলিলেন, পশ্চিমদিকে চলিলেন ও উত্তরদিকে চলিলেন—সঙ্গে সঙ্গে দেবতা, সাম ইত্যাদি চলিলেন। তাহার পর উর্দ্ধদিকে চাহিয়া এক বৎসর দাঁড়াইয়া রহিলেন। এইরূপে দেখা গেল, তাঁহার পাঁচ মাথা হইল। তিনি একবৎসর উর্দ্ধমুখে দাঁড়াইয়া থাকিলে, দেবতাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রাত্য! তুমি দাঁড়াইয়া আছ কেন? তিনি বলিলেন, আমায় আসন্দী (চারপাই) দাও। দেবতারা দিলেন। চারিটি সাম উহার দুইটি বাজু ও দুইটি আড়ানি হইল। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত, বসন্ত চারিটি পায়া হইল। ঋক্‌গুলি লম্বা দড়ি হইল, যজুগুলি ছোট দড়ি হইল, বেদগুলি বিছানার চাদর হইল, মন্ত্রগুলি বালিস হইল, সাংবেদ উঁহার বসিবার স্থান হইল, উদ্গীথ ঠেসান দিবার তাকিয়া হইল। দেবতারা তাঁহার অনুচর হইলেন ও তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। একব্রাত্য মহাদেব "স্তত্মমরগণৈঃ" হইলেন। যে বেদ বিশ্বের আদ্য—বিশ্বের বীজ, তিনি তাহাতেই চাপিয়া বসিলেন। কিন্তু এখনও ইনিই যে শিব, এ কথা জোর করিয়া বলা যায় না, কিন্তু ঐ অধ্যায়ের পঞ্চম খণ্ডে যাহা আছে, তাহা পড়িলে আর বিশেষ সন্দেহ থাকে না। তিনি অন্তর্দ্দেশ হইতে পূর্ব্ব দিকে চলিলেন, পূর্ব্বদিক্ তাঁহাকে ভব নামে এক অনুচর দিলেন; দক্ষিণদিক্ হইতে সর্ব্ব, পশ্চিমদিক্ হইতে পশুপতি নামে এক অনুচর পাইলেন, উত্তরদিক্ তাঁহাকে উগ্র নামে এক অনুচর দিল, ধ্রুবা দিক্ তাঁহাকে রুদ্র নামে এক অনুচর দিলেন। উর্দ্ধদিক্ তাঁহাকে মহাদেব নামে এক অনুচর দিল, অন্তর্দ্দেশ তাঁহাকে ঈশান নামে এক অনুচর দিল। আমাদের শিবের পূজায় যে অষ্টমূর্ত্তি পূজা করিতে হয়, একব্রাত্য তাহার সাতটি মূর্ত্তি এখানে পাইলেন। ব্রাত্যেরা ঋষি-সমাজে আসিলে, ব্রাত্যদের দেবতা শিবও ঋষি-সমাজে আসিয়া মিলিলেন। ব্রাত্যেরা যাযাবর ছিল, শিবও যাযাবর; তিনি কোথায় যান, কোথায় থাকেন—কিছু ঠিক নাই। তিনি শ্মশানে থাকেন—মশানে থাকেন—নদীতীরে থাকেন—বনে থাকেন। যাযাবরেরা আমাদের ন্যায় পাপের ভয় করে না; শিবও করেন না; তিনি

ঠিক যাযাবরদিগের দেবতা—গৃহস্থদিগের নহেন। যাযাবরদিগের অনেক স্বভাব-চরিত্র এখনও তাঁহাতে দেখিতে পাওয়া যায়।

ঐ অধ্যায়ে লেখা আছে, ব্রাত্য যদি কোন অগ্নিহোত্রীর বাড়ী অতিথি হন এবং সে তখন অগ্নিহোত্র করিতে থাকে, সে তখন অগ্নিহোত্র ছাড়িয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিবে এবং বলিবে, আপনি যদি অনুমতি করেন, তবে আমি অগ্নিহোত্র সমাধা করি। তিনি অনুমতি দিলে, করিবে—না দিলে, করিবে না; যদি করে, তাহার ফল মন্দ হইবে। সুতরাং শিব যাগযজ্ঞের অতীত। লোকে তাঁহাকে ভাগ দিক, বা না দিক, তাঁহার তাতে আসেও না, যায়ও না। সুতরাং দক্ষযজ্ঞে তাঁহার শ্বশুর যে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করেন নাই, তিনি তাহা উপেক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু পার্ব্বতী উপেক্ষা করেন নাই বলিয়া, তাঁহাকে দক্ষযজ্ঞ নষ্ট করিতে হইয়াছিল। এত বড় একটা কাণ্ড হইল, তবে শিবের যজ্ঞে ভাগ হইল। এই কাণ্ডে ত্রিভুবন বিধ্বংস হইতে বসিয়াছিল। দক্ষযজ্ঞ নষ্ট হইয়াছিল, দক্ষের কাটা মাথায় একটী ছাগমুণ্ড বসিয়াছিল, দেবগণ পলায়ন করিয়াছিলেন,—সতী মারা গিয়াছিলেন। এত করিয়া মহাদেবের ভাগ সাব্যস্ত হইয়াছিল।

অথর্ব্ববেদের ১৫শ অধ্যায়ে যে একব্রাত্যকে বাড়ান হইয়াছে, তাহা সংক্ষেপে বুঝান যায় না। সমস্তটি বারংবার না পড়িলে বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম হয় না। একব্রাত্য কেবল ঘুরিতেছেন, কখনও উত্তরদিকে যাইতেছেন, কখনও দক্ষিণদিকে যাইতেছেন, কখনও পূর্ব্বদিকে যাইতেছেন, কখনও পশ্চিমদিকে যাইতেছেন, কখনও ধ্রুবাদিকে যাইতেছেন, কখনও পরমাদিকে যাইতেছেন, কখনও উর্দ্ধদিকে যাইতেছেন, কখনও অন্তর্দ্দেশের মধ্যে ঘুরিতেছেন, কখনও অনাবৃত্তদিকে যাইতেছেন, কখনও অনাদিষ্টা দিকে যাইতেছেন, কখনও বৃহতি দিকে যাইতেছেন, কখনও পৃথিবীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সমুদ্র হইতেছেন। একব্রাত্য ঠিক একটি বেদে, ঘর নাই, বাড়ী নাই—যেখানে ইচ্ছা, সেখানে যাচ্ছেন। যাযাবরেরা প্রায়ই চোর হয়, সেই জন্যই শিবের ছেলে (কার্ত্তিক) চোর-চক্রবর্ত্তী, তিনি চৌরশাস্ত্রের প্রবর্ত্তক, চোরেদের আদি গুরু। চোরেরা তাঁহাকে প্রণাম না করিয়া সিঁধকাটী ছোঁয় না। চোরেদের যে বই আছে, তাহার নাম "ষণ্মুখকল্প"।

শিবকে ধরিবার প্রধান উপায়, তাঁহার অষ্টমূর্ত্তির পূজা। অথর্ব্ববেদে কিন্তু তাঁহার সাত অনুচর আছেন, সর্ব্ব, ভব, পশুপতি, উগ্র, রুদ্র, মহাদেব, ঈশান। আমরা যে অষ্টমূর্ত্তির পূজা করিয়া থাকি, তাহার মধ্যে কেবল ভীম নাই। এই যে সাত অনুচর আসিয়াছেন, তাঁহারা দিক্ হইতে আসিয়াছেন, ইঁহারা যে কি—তাহার কিছু ঠিক নাই। কিন্তু শতপথব্রাহ্মণে যে গল্পটী আছে, তাহাতে অষ্টমূর্ত্তিই আছে। প্রথমে প্রতিষ্ঠা হইল, প্রতিষ্ঠা হইতে ভূমি হইল, ভূমি বিস্তৃত হইতে লাগিল—পৃথিবী হইল। ভূতগণ, ভূতপতি—এই প্রতিষ্ঠায় সম্বৎসর ধরিয়া প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ভূতপতি গৃহস্থ ছিলেন। উষা তাঁহার স্ত্রী—ঋতুবাহ ভূতগণ; ভূতপতি সম্বৎসর তাঁহার স্ত্রী

উষাই ঐষধী। ভূতগণ ও ভূতপতির পুত্র হইল—কুমার। সে কাঁদিতে লাগিল। প্রজাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কাঁদ কেন? অনেক তপস্যা, অনেক শ্রম করিয়া তোমায় পাওয়া গিয়াছে, তুমি কাঁদ কেন?" সে বলিল, "আমার পাপ যায় নাই; আমার একটা নাম দাও।" ছেলে হ'লে তার একটা নাম দিতে হয়, নইলে তার পাপ যায় না। প্রজাপতি বলিলেন, "তোমার নাম রুদ্র।" যেহেতু, অগ্নিই রুদ্র, সেহেতু কুমারও অগ্নি হইলেন। কুমার আবার বলিলেন, "নাম দাও"। প্রজাপতি বলিলেন, "তোমার নাম—"সর্ব্ব"।" সর্ব্ব—জল; কুমার জল হইলেন। কুমার আবার নাম চাহিলেন। এবার হইলেন, "পশুপতি"। পশুপতি হইলেন—ওষধি; কুমার ওষধি হইলেন। আবার নাম চাহিলেন, এবার হইলেন, "উগ্র"। কুমার বায়ু হইলেন। কুমার নাম চাহিলেন। প্রজাপতি বলিলেন, তুমি "অশনি"। বিদ্যুৎই অশনি—কুমার বিদ্যুৎ হইলেন। ফের নাম চাহিলেন। এবার হইলেন "ভব"। ভব মেঘ; কুমার মেঘ হইলেন। ফের নাম চাহিলেন। কুমার "মহাদেব" হইলেন—মহাদেব চন্দ্রমা; কুমার চন্দ্রমা হইলেন। ফের নাম চাহিলেন, এবার হইলেন "ঈশান"। ঈশান হইলেন "আদিত্য"; কুমার আদিত্য হইলেন। কুমার বলিলেন, আর নাম চাহি না। শতপথব্রাহ্মণে বলে—কুমার অগ্নি; এ সকল অগ্নির নাম। মেয়ার (Muir) সাহেব বলিয়াছেন, ইহাতে রুদ্রের উৎপত্তির কথা বলা হইল, কিন্তু আমরা দেখিতেছি, ইহাতে কুমারের উৎপত্তির কথা বলা হইল। কুমারের এক মূর্ত্তি রুদ্র, কিন্তু কুমারের আরও সাত মূর্ত্তি আছে। সব ক'টাই অগ্নির মূর্ত্তি। এই কুমারই শেষে পার্ব্বতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া দেবসেনাপতি হইয়াছিলেন। কিন্তু শাঙ্খায়ন ব্রাহ্মণে এই অষ্টমূর্ত্তি মহাদেবের বলা হইয়াছে। প্রজাপতি সৃষ্টি ইচ্ছা করিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন, তপস্যা হইতে অগ্নি, বায়ু, চন্দ্রমা, আদিত্য, উষা জন্মগ্রহণ করিলেন। প্রজাপতি বলিলেন, তোমরাও তপস্যা কর। তাঁহাদের তপস্যা হইতে এক পদার্থ নির্গত হইল। তাহার সহস্রাক্ষ, সহস্র পদ এবং সহস্র বাণ—সে প্রজাপতির নিকট আসিয়া বলিল, আমার একটি নাম দাও নহিলে কিছু খাইব না। প্রজাপতি প্রথম নাম দিলেন—ভব অর্থাৎ জল। তাহার পর নাম দিলেন, সর্ব্ব অর্থাৎ অগ্নি; তার পর পশুপতি—অর্থাৎ বায়ু। চতুর্থ নাম দিলেন, উগ্রদেব অর্থাৎ ওষধি এবং বনস্পতি; তার পর নাম দিলেন, মহান্ দেব অর্থাৎ আদিত্য; তার পর নাম দিলেন, রুদ্র অর্থাৎ চন্দ্র। তার পর নাম দিলেন, ঈশান অর্থাৎ অন্ন। তাহার অষ্টম নাম হইল, অশনি অর্থাৎ ইন্দ্র। এই আটটি নাম দিয়া কৌষীতকী ব্রাহ্মণ বলিতেছেন, ইনিই মহাদেব—ইঁহারই আটটি নাম আটটি মূর্ত্তি। রুদ্র তাঁহার এক মূর্ত্তি মাত্র। সুতরাং শিব, শম্ভু, মহাদেব, রুদ্র হইতে পারেন না। অমরকোষে মহাদেবের ৪৮টি নাম আছে, তাহার শেষাশেষি একটি নাম রুদ্র। কিন্তু অমরকোষে কিছু বিশেষ থাকিলেও, অনেক শব্দ এক অর্থে এক পর্য্যায়ে ব্যবহার হয়। আমরা

এতক্ষণ দেখাইলাম, শিব, শম্ভু, মহাদেব ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ ইত্যাদিতে যখন নাই, তখন উনি আর্য্য ঋষিদের দেবতা নহেন। যাযাবর ব্রাত্যদিগের দেবতা। ব্রাত্যেরা ঋষি-সমাজে স্থান পাইল; উনিও ব্রাত্যদের সঙ্গে সঙ্গে ঋষিদের মধ্যে স্থান পাইলেন। কিন্তু স্থানটা অনেক দিন ধরিয়া পাকাপাকি হয় নাই। শতপথব্রাহ্মণে অগ্নির মূর্ত্তি বলিয়াছে, কৌষীতকী ব্রাহ্মণে উঁহাকে নূতন দেবতা বলিয়াছে; অথর্ব্ববেদে উঁহাকে একব্রাত্য, অর্থাৎ, সকলের বড় ব্রাত্য অর্থাৎ ব্রাত্যদের Spirit বা দেবতা বলিয়াছে। তাঁহার যে অষ্টমূর্ত্তি, অথর্ব্ববেদে তাহার একটি নাই—বাকী সাতটির ব্যাখ্যা দিক্ হইতে আসিয়াছে। শতপথ ও কৌষীতকীতে মহাভূত হইতে আসিয়াছে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষরা দেখিয়া শুনিয়া বলিয়াছেন,—

১। সর্ব্বায় ক্ষিতিমূর্ত্তয়ে নমঃ। ২। ভবায় জলমূর্ত্তয়ে নমঃ। ৩। রুদ্রায় অগ্নিমূর্ত্তয়ে নমঃ। ৪। উগ্রায় বায়ুমূর্ত্তয়ে নমঃ। ৫। ভীমায় আকাশমূর্ত্তয়ে নমঃ। ৬। পশুপতয়ে যজমানমূর্ত্তয়ে নমঃ। ৭। মহাদেবায় সোমমূর্ত্তয়ে নমঃ। ৮। ঈশানায় সূর্য্যমূর্ত্তয়ে নমঃ। মধ্যে নমঃ শিবায়।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

---

# "মহাদেব" প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা

শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয় যে সকল বিষয়ের অদ্য আলোচনা করিলেন, তাহা সম্পূর্ণ নূতন। যাঁহারা এখানে বা পশ্চিমদেশে এই সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়া থাকেন, তাঁহারাও এ কথা বলিতে বাধ্য হইবেন যে, শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয় শিবতত্ত্বের আলোচনা দ্বারা গবেষণার নূতন বীজ বুনিয়া দিয়াছেন। ইঁহার সকল উক্তিই এখনও অবিসংবাদী সত্যতে পরিণত না হইলেও, তাঁহার অপূর্ব্ব গবেষণার ফলে যে শিবতত্ত্ব নিষ্কাষিত হইয়াছে, সকলেই তাহার ফলভাগী হইবেন। আশা করি, ভবিষ্যতে এ সম্বন্ধে আরও আলোচনা হইবে। শাস্ত্রী মহাশয় ব্রাত্য সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ নূতন। ব্রাত্য শব্দ খুব প্রাচীন। ইহা বেদ ও উপনিষদে ব্যবহৃত হইয়াছে। উপনিষদে প্রাণকে ব্রাত্য বলিয়া সম্বোধন করা আছে।

শঙ্করাচার্য্য প্রাণকে হিরণ্যগর্ভ বলিয়াছেন। "সাবিত্রীপতিতা ব্রাত্যাঃ।" এখন প্রাণের এই অর্থই চলিত। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে ব্রাত্যের অন্য অর্থ প্রচলিত ছিল।

অথর্ব্ববেদ ও তাণ্ড্য ব্রাহ্মণ হইতে শাস্ত্রী মহাশয় সেই প্রাচীন অর্থ আবিষ্কার করিয়াছেন।

রুদ্রের সম্বন্ধে শাস্ত্রী মহাশয় যেরূপ বলিলেন, তাহাতে চিত্তে একটু সংশয় উঠিল। যজুর্ব্বেদের শতরুদ্রীয় অধ্যায়ে দেখা যায় যে, রুদ্র পশুপতি, গিরিশ ইত্যাদি। তাঁহার

'শিবা তনু' 'দক্ষিণ মুখের' উল্লেখ পাই। অর্থাৎ তখন ঋষি-সমাজে রুদ্র ঈশ্বরের স্থান অধিকার করিয়াছেন।

শাস্ত্রী মহাশয় এই যে ভব প্রভৃতি সপ্ত বা অষ্ট মূর্ত্তির উল্লেখ করিলেন, তাহাতে মনে হয় যে, ঐরূপ আখ্যা দেওয়ার পূর্ব্বে এই অষ্টমূর্ত্তি ঋষি-সমাজে প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। কিরূপে হইল, এ তথ্য আমরা শাস্ত্রী মহাশয়ের মুখে শুনিতে চাই। যাহা হউক, শাস্ত্রী মহাশয় যেরূপভাবে মহাদেবের আলোচনা করিলেন, এরূপ আলোচনা অন্যত্র কেহ করেন নাই। আজ অনেক নূতন বিষয় শিখিলাম এবং গবেষণার এক নূতন ভবিষ্যৎ আমাদের চক্ষের সাম্‌নে খুলিয়া গেল।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

প্রিণ্টার—শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী
**কালিকা প্রেস**
২১-নং-নন্দকুমার চৌধুরীর দ্বিতীয় লেন, কলিকাতা।

# মৌর্য্য-যুগের ভারতীয় সমাজ*

এই প্রবন্ধে মৌর্য্য-যুগের ও প্রসঙ্গক্রমে মৌর্য্যপূর্ব্ব-যুগের ভারতীয় সমাজের অবস্থা বিবৃত করাই লেখকের উদ্দেশ্য। উক্ত যুগের সমাজের অবস্থা জানিতে হইলে আমাদিগকে প্রথমতঃ প্রাচীনতম বৌদ্ধগ্রন্থগুলি—যেগুলিতে ভগবান্ বুদ্ধ ও তৎসমসাময়িক মনীষিবৃন্দের উক্তি অবিকৃত বা স্বল্প পরিবর্ত্তিতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, সেগুলিকে বিশেষভাবে দেখিয়া লইতে হইবে। অতঃপর তৎপরবর্ত্তী মৌর্য্যরাজগণের রাজত্বকালে রচিত গ্রন্থগুলি হইতে সমসাময়িক সামাজিক অবস্থা পর্য্যালোচনা করিতে হইবে। এইরূপ আলোচনা ও তুলনার ফলে, আমরা তৎকালীন সমাজ, সামাজিক আদর্শ ও তদুভয়ের পরিবর্ত্তন ও উহার মূলীভূত কারণ বুঝিতে পারিব।

যে মৌর্য্যযুগের সামাজিক ইতিহাস আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়, উহা ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি জাতীয় কীর্ত্তি ও প্রাধান্যের যুগ। সে যুগে ভারতবাসী জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, নৈতিক বলে ও বাহুবলে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ভারতের ধনৈশ্বর্য্য, সামরিক শক্তি ও নৈতিক বল সকলই বিদেশীর চক্ষে অতুলনীয় বলিয়া বোধ হইত। ভারতবাসীর স্বাধীন চিন্তার স্রোতঃ তখনও রুদ্ধ হয় নাই। ভারতবাসী পৃথিবীর ক্ষণিকবাদ বা প্রাকৃতিক জগতের মায়াবাদের মোহে উদ্ভ্রান্তচিত্ত হইয়া, আত্মোন্নতির চিন্তায় জলাঞ্জলি দিয়া, তখনও আলস্য ও তমোগুণের জড়তায় আত্মবিসর্জ্জন দেন নাই। ধর্ম্মের নামে নৈষ্কর্ম্ম ও সদাচারের নামে রক্ষণশীলতা তখনও দেশে প্রবেশ করে নাই। ভারতীয় মনস্বীর চিন্তাশক্তি তখনও অব্যাহত ছিল এবং দেশের নৈতিক ও মানসিক অবনতির বীজ তখনও রোপিত হয় নাই।

গুণকর্ম্মবিভাগ-মূলক চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজে প্রত্যেক বর্ণই নিজ নিজ কর্ম্মের ও তৎফলে দেশের শ্রীবৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া নিজ কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর ছিলেন। ব্রাহ্মণ জ্ঞানবলে বলীয়ান্ হইয়া, মোক্ষচিন্তার সঙ্গে সঙ্গে সমাজ ও দেশের উন্নতির চিন্তায় অনুপ্রাণিত ছিলেন। জাতিমাত্রোপজীবী ভিক্ষান্নপুষ্ট ব্রাহ্মণের স্থান তখনও দেশে ছিল না। ক্ষাত্রশক্তি তখনও সমাজ ও দেশের রক্ষণকে পরমধর্ম্ম জ্ঞান করিয়া, বিদেশী শত্রুর দমনে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। বৈশ্য শূদ্রও বার্ত্তা ও কৃষিকার্য্যের দ্বারা সমাজের পুষ্টি ও সেবার জন্য যত্নবান্ ছিলেন। ফলে সমাজের সর্ব্বপ্রকারেই উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। রাজশক্তি (অবশ্য একেবারে প্রজাতন্ত্র না হইলেও) বিদেশী শত্রুর হস্ত হইতে দেশরক্ষা করিয়া, প্রজাবর্গের পালনে যত্নবান্ ছিলেন। প্রজাশক্তিও নিজ নিজ কর্ত্তব্য না ভুলিয়া, রাজার নিদেশানুবর্ত্তী হইয়া, ন্যায় ও ধর্ম্মের রক্ষাকল্পে বদ্ধপরিকর ছিলেন। এই সকল কারণে দেশের অবস্থা ভালই ছিল। নিত্য অভাব, দারিদ্র্য, পরমুখাপেক্ষিত্ব ও বিদেশীয় উৎপীড়ন—কিছুই ছিল না।

ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রকারের উৎকর্ষই অক্ষুণ্ণ ছিল। জ্ঞানবল, বাহুবল বা ধনবল—ভারতবাসীর

* [illegible] বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ৫ম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

কিছুরই অভাব ছিল না। বিদেশী শত্রু অবাধে ভারতে প্রবেশ করা দূরে থাকুক, ভারতীয় শক্তির নামে ভীত হইতেন। যে যুগের কথা লিখিতেছি, সেই যুগেই প্রবলপরাক্রান্ত বিশ্ববিজয়ী গ্রীকবীর সেকেন্দর শাহও মগধসম্রাটের অতুল শক্তির কথায় ভীত হইয়া, ক্ষুব্ধচিত্তে ভারতজয়ের আশা ত্যাগ করিয়া স্বদেশ প্রত্যাগমনে বাধ্য হইয়াছিলেন।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই মৌর্য্যযুগে ভারতের সমাজ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে। মৌর্য্যযুগ বলিতে গেলে সাধারণতঃ ঐতিহাসিকের মতে ৩২৫ খৃঃ পূঃ হইতে খৃঃ পূঃ ১৭৫ অব্দ পর্য্যন্ত সার্দ্ধশতাব্দী কালকে বুঝায়। সামাজিক ইতিহাসের বিষয় আলোচনা করিতে গেলে, মৌর্য্য-সাম্রাজ্য স্থাপনের কিছু কাল পূর্ব্ব হইতে এবং মৌর্য্য-সাম্রাজ্যের অবসানের কিছু কাল পর পর্য্যন্ত সময়ের সমাজের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিতে হইবে। কারণ, মৌর্য্য-সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসনারোহণের সঙ্গে সঙ্গে একটি নূতন সমাজ সহসা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই এবং মৌর্য্যরাজগণের তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গেই সেই সমাজ সহসা বিলুপ্ত হয় নাই। প্রসঙ্গক্রমে মৌর্য্য-পূর্ব্বযুগের সামাজিক বিষয় আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন। কেন না, উক্ত যুগে ধর্ম্ম ও সমাজের উন্নতিকল্পে বুদ্ধ, মহাবীর ও অন্যান্য ধর্ম্মাচার্য্যগণ ও সংঘনায়কেরা নিজ নিজ মত প্রচার করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ ঋষিরাও এ বিষয়ে নিশ্চেষ্ট থাকেন নাই। তাঁহারাও ধর্ম্ম ও সমাজ বিষয়ে রক্ষণশীলতার পক্ষপাতী ছিলেন না। বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের বিপক্ষে তাঁহারাই সর্ব্বপ্রথমে অভ্যুত্থান করিয়া, উহা অপেক্ষা জ্ঞানের প্রাধান্য স্থাপনে যত্নবান্ হইয়াছিলেন। সমাজ সম্বন্ধেও তাঁহারা দেশ, কাল, পাত্র-ভেদে পরিবর্ত্তনশীলতার পক্ষপাতী ছিলেন। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন নীতিগুলির সংঘর্ষে সমাজের বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটে। এইগুলির আলোচনা বিশেষ প্রয়োজনীয়। তবে দুঃখের বিষয়, সামাজিক ইতিহাসে বৌদ্ধ বা জৈন মহাপুরুষদিগের মত সম্বন্ধে আমরা বিশেষ অনভিজ্ঞ। আবার ঠিক ঐ যুগে রচিত ব্রাহ্মণ-গ্রন্থও অতিবিরল। দুই একখানি যাহা আছে, তাহাদের রচনার কাল লইয়াও বিশেষ মতভেদ আছে। এ অবস্থায় গ্রীক্ ঐতিহাসিকদিগের সমসাময়িক বিবরণই আমাদের একমাত্র ভরসা ছিল।

মৌর্য্য-যুগের স্থিতিকাল।

কয়েক বৎসর হইল, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং মহীশূর গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক উহা প্রকাশিত ও ইংরাজী ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। এই অর্থশাস্ত্র এক বিরাট্ গ্রন্থ। যে ব্রাহ্মণ রাজনৈতিকের মন্ত্রশক্তি ও প্রতিভাবলে প্রবলপরাক্রান্ত নন্দরাজগণ উৎখাত ও মগধে মৌর্য্যরাজ চন্দ্রগুপ্ত প্রতিষ্ঠিত হন, সেই কৌটিল্য বা চাণক্যই এই গ্রন্থের রচয়িতা।

উপস্থিত ক্ষেত্রে চাণক্য বা কৌটিল্যের পরিচয় বা জীবনী লইয়া আমাদের ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই। হিন্দু রাজনীতি ও সাহিত্যে চাণক্যের নামের উল্লেখ ও তাঁহার কূটবুদ্ধির কথা বহু স্থলে উল্লিখিত হইয়াছে। তবে এ ক্ষেত্রে প্রসঙ্গক্রমে একটি কথা বলা যাইতে পারে যে, হিলেব্রাণ্ড-প্রমুখ কোন কোন ইউরোপীয় পণ্ডিতের মতে অর্থশাস্ত্র কৌটিল্যের নিজের রচিত নহে, তাঁহার কোন শিষ্য বা প্রশিষ্যের রচিত। তাঁহাদের এরূপ সন্দেহের কারণ এই যে, উক্ত গ্রন্থের বহু স্থানে মতবিশেষের খণ্ডন বা সমর্থনের জন্য কৌটিল্যের নিজের নাম উল্লেখ করিয়া, তাঁহার মত উদ্ধৃত

হইয়াছে এবং "ইতি কৌটিল্যঃ", "নেতি কৌটিল্যঃ" প্রভৃতি বাক্য ব্যবহৃত হইয়াছে। কিছু দিন হইল, এই নূতন মতও খণ্ডিত হইয়াছে।

অর্থশাস্ত্রের তিন চারি স্থানে উক্ত গ্রন্থ কৌটিল্যের রচিত বলিয়া লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থারম্ভে ভূমিকায় "কৌটিল্যেন কৃতং শাস্ত্রং বিমুক্তগ্রন্থবিস্তরম্"—এই কথা বলা হইয়াছে। আবার গ্রন্থের মধ্যে এক স্থানে বলা হইয়াছে যে, উক্ত গ্রন্থ "কৌটিল্যেন নরেন্দ্রার্থে" অর্থাৎ কোন লোকপালের উপদেশের জন্য কৌটিল্য কর্ত্তৃক রচিত। * অবশেষে গ্রন্থের উপসংহার স্থলেও উক্ত গ্রন্থ চাণক্যের রচিত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে,—

"যেন শাস্ত্রং চ শস্ত্রং চ নন্দরাজগতা চ ভূঃ।
অমর্ষেণোদ্ধৃতান্যাশু তেন শাস্ত্রমিদং কৃতম্॥"

এতদ্ভিন্ন গ্রন্থের ভাষা এবং গ্রন্থে বর্ণিত সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা প্রভৃতির পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, গ্রন্থ কৌটিল্যের স্বরচিত এবং কৌটিল্যের সমসাময়িক মৌর্য্য-যুগই উহার রচনা-কাল। অর্থশাস্ত্রের সমাজের চিত্রের সহিত গ্রীকদিগের লিখিত ভারতীয় সামাজিক ও রাজনৈতিক চিত্রের বহু সাদৃশ্য আছে। যথাসময়ে তাহার আলোচনা করা হইবে।

অর্থশাস্ত্রের সময় নির্দ্দেশের পর, আমরা অর্থশাস্ত্রবর্ণিত সমাজের বিষয় আলোচনা করিব। সেই যুগের আর্য্য-সমাজ চাতুর্ব্বর্ণ্যমূলকই ছিল, অর্থাৎ সমাজ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারি বর্ণের লোক লইয়া গঠিত ছিল। কিরাত-চণ্ডালাদি অন্ত্যজ বর্ণ ও বন্যজাতীয় লোকের স্থান বোধ হয়, সমাজের মধ্যে ছিল না। কেন না, অর্থশাস্ত্রে দেখা যায় যে, নগরে বা গ্রামের মধ্যে ইহাদিগকে বাস করিতে দেওয়া হইত না—ইহাদের স্থান পল্লীর বাহিরে ছিল (জনপদ-নিবেশ—৪৬ পৃষ্ঠা)। "পাষণ্ডচণ্ডালানাং শ্মশানান্তে বাসঃ।"—(৫৮ পৃষ্ঠা)। প্রাচীনতম বৌদ্ধগ্রন্থগুলি এবং জাতকেও চণ্ডালেরা ঐরূপ অস্পৃশ্য ও সমাজবহির্ভূত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

হিন্দুসমাজের এই চারি বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণের প্রাধান্য অর্থশাস্ত্রে বিশদভাবে বর্ণিত আছে। বহু পূর্ব্বেই উহা স্থাপিত হইয়াছিল। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে বৌদ্ধধর্ম্ম স্থাপনের সময় ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা ক্ষত্রিয়াপেক্ষা ন্যূন ছিল। প্রখ্যাতনামা পালিভাষাবিদ্ ঐতিহাসিক ডাক্তার রিজ্ ডেভিড্স্ তাঁহার Buddhist India বা বৌদ্ধ-ভারত গ্রন্থে এই বিষয়ের আলোচনা করিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তিকালে বোধ হয়, সমাজে ক্ষত্রিয়-প্রাধান্যই ছিল।

এ স্থলে এ বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। তবে এইটুকু মাত্র বলা যাইতে পারে যে, বৌদ্ধ-যুগের বহু পূর্ব্বেই ব্রাহ্মণপ্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছিল। তবে বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকেরা ক্ষত্রিয় ছিলেন এবং তাঁহারা ব্রাহ্মণপ্রাধান্য স্বীকার করিতেন না। Rhys Davids মহোদয় কেবলমাত্র বৌদ্ধগ্রন্থালোচনার ফলে যে তথ্যে উপনীত হইয়াছিলেন,

---

* সর্ব্বশাস্ত্রাণ্যনুক্রম্য প্রয়োগমুপলভ্য চ।
কৌটিল্যেন নরেন্দ্রার্থে শাসনস্য বিধিঃ কৃতঃ॥—শাসনাধিকারঃ, ৭৫ পৃষ্ঠা।

তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত বা যথার্থ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। বৌদ্ধ ও জৈনদিগের মত যাহাই হউক না কেন, হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিতেন এবং সামাজিক প্রাধান্য ভিন্ন ব্রাহ্মণের কতকগুলি বিশেষ অধিকার বা পরিহার ছিল। এই পরিহারগুলি হইতে ব্রাহ্মণের প্রকৃত সামাজিক মর্য্যাদা বুঝা যাইবে। অগ্রে আমরা সেইগুলির উল্লেখ করিব। যে কোন প্রকার অপরাধে অপরাধী হউন না কেন, ব্রাহ্মণের প্রাণদণ্ড বা কায়িক দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল না। কৌটিল্য বলেন,—

"সর্ব্বাপরাধেষ্বপীড়নীয়ো ব্রাহ্মণঃ। তস্যাভিশস্তাঙ্কো ললাটে স্যাদ্ব্যবহারপতনায়। স্তেয়ে শ্বা। মনুষ্যবধে কবন্ধঃ। গুরুতল্পে ভগম্। সুরাপানে মদ্যধ্বজঃ।

ব্রাহ্মণং পাপকর্ম্মাণমুদ্ঘুষ্যাঙ্ককৃতব্রণম্।

কুর্য্যান্নির্বিষয়ং রাজা বাসয়েদাকরেষু বা॥"—( ২২২ পৃঃ )।

দোষাশঙ্কায় ( suspicion of guilt ) ব্রাহ্মণ ও ব্রতশালীদিগের কেবলমাত্র প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ( জেরা ) করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইত বা বিশেষ অপরাধের স্থল থাকিলে চার-রক্ষিত করিয়া রাখা হইত। অন্য বর্ণের অপরাধীদিগের ন্যায় যন্ত্রণা বা উৎপীড়নাদি দ্বারা দোষ-স্বীকার করিতে বাধ্য করা হইত না। কোন রাজকর্ম্মচারী উল্লিখিত নিয়ম লঙ্ঘন করিলে তাঁহাকে দণ্ডভাগী হইতে হইত।

অর্থ-দণ্ডাদি স্থলেও বিশেষ নিয়ম ও পরিহার ছিল। প্রাচীন সূত্রকার গৌতমের মতে ব্রাহ্মণ চৌর্য্যাপরাধে অপরাধী হইলে, তাঁহাকে শূদ্র অপরাধীর দণ্ডের ৬৪ গুণ অর্থদণ্ড দিতে হইত। অর্থশাস্ত্রে এ নিয়মের উল্লেখ নাই। তবে কতকগুলি কার্য্য ব্রাহ্মণের বিশেষ অপরাধ বলিয়া পরিগণিত হইত। যেমন, সুরাপানাদি শূদ্রাদির পক্ষে কোন অপরাধ বলিয়াই গণ্য হইত না, কিন্তু ব্রাহ্মণ সুরাপায়ী হইলে তাঁহাকে ললাটে চিহ্নিত করিয়া রাজ্য হইতে বিতাড়িত করা হইত। অর্থদণ্ডের সম্বন্ধে কৌটিল্যে একটি বিশেষ বিধি দেখা যায়। উহা এই যে, যদি কোন ব্রাহ্মণ বা অন্যধর্ম্মাবলম্বী পাষণ্ড তপস্বী অর্থদণ্ডে অশক্ত হইতেন, তাহা হইলে তাঁহারা অর্থের বিনিময়ে জপ-তপাদি দ্বারা রাজার মঙ্গলকামনা করিয়া বা উপবাসাদি করিয়া অর্থদণ্ড-দায় হইতে মুক্ত হইতে পারিতেন।

ব্রাহ্মণ, বিশেষতঃ শ্রোত্রিয় সাধারণতঃ সাক্ষিরূপে আহূত হইতেন না। হইলেও সাক্ষ্যদানকালে বিনা শপথে বক্তব্য বলিতে পারিতেন। বিচারক ব্রাহ্মণ সাক্ষীকে "ব্রূহি" বলিয়া সাক্ষ্যদানের আদেশ করিতেন।

শ্রোত্রিয় বা বেদপারগ ব্রাহ্মণেরা 'অকর' ছিলেন, অর্থাৎ তাঁহাদিগকে কোন প্রকার কর দিতে হইত না। অর্থশাস্ত্রে ব্রাহ্মণমাত্রেরই কর-রাহিত্যের উল্লেখ নাই। তবে বিদ্বান্ শ্রোত্রিয়দিগকে নিষ্কর ভূমি দানের উল্লেখ আছে। এই সমস্ত ভূমি 'ব্রহ্মদেয়' বলিয়া পরিগণিত হইত এবং সর্ব্বপ্রকার কররহিত ছিল। অতি প্রাচীনতম বৌদ্ধগ্রন্থে এই সকল ব্রহ্মদেয় ভূমির উল্লেখ পাওয়া যায়। 'দীঘনিকায়' গ্রন্থে কতিপয় সূত্রে আমরা ব্রহ্মদেয়ভোগী মহাশাল ব্রাহ্মণ-

দিগের উল্লেখ পাইয়া থাকি। * এই মহাশালগণ কোন প্রকার কর দান করিতেন না এবং এ ভিন্ন তাঁহাদের অন্যান্য বিশিষ্ট অধিকার ছিল।

ব্রাহ্মণমাত্রেরই অকরত্ব সম্বন্ধে, ধর্ম্মসূত্র ও ধর্ম্মশাস্ত্রাদিতে মতভেদ দৃষ্ট হয়। আপস্তম্ব ও বৌধায়ন ধর্ম্মসূত্রে "অকরঃ শ্রোত্রিয়ঃ" এই সূত্রটি হইতে কেবলমাত্র শ্রোত্রিয়ই অকর ছিলেন বলিয়া বুঝা যায়। কিন্তু বশিষ্ঠ-ধর্ম্মশাস্ত্রের মতে ব্রাহ্মণমাত্রেই অকর ছিলেন। বশিষ্ঠ বলেন,—

"রাজা তু ধর্ম্মেণানুশাসন্ ষষ্ঠং অংশং হরেৎ ধনস্য। অন্যত্র ব্রাহ্মণাৎ। ইষ্টাপূর্ত্তস্য তু ষষ্ঠমংশং ভজতি। ব্রাহ্মণো বেদমাঢ্যং করোতি, ব্রাহ্মণ আপদ উদ্ধরতি। তস্মাৎ ব্রাহ্মণোঽনাদ্যঃ— সোমোঽস্য রাজা ভবতি।"

অর্থশাস্ত্রে ব্রাহ্মণমাত্রের অকরত্বের উল্লেখ নাই। শ্রোত্রিয়দিগের কথাই বিশেষভাবে লিখিত হইয়াছে। কর-রাহিত্য ভিন্ন তাঁহাদিগের অন্যান্য অধিকার ছিল। তাঁহারা বিনা শুল্কে লবণ পাইতেন। (শ্রোত্রিয়াস্তপস্বিনো বিষ্টয়শ্চ ভক্তলবণং হরেয়ুঃ। অঃ শাঃ, ৮৪ পৃষ্ঠা)। যজ্ঞ, উপবীত, চৌল প্রভৃতি কার্য্যের জন্য অন্য জনসাধারণের ন্যায় তাঁহাদের দ্রব্য সম্ভারের উপর শুল্ক লওয়া হইত না। (কৌ. ১১১—বৈবাহিকমন্বায়নমৌপষানিকং যজ্ঞকৃত্যপ্রসবনৈমিত্তিকং দেবেজ্যাচৌলোপনয়নগোদানব্রতদীক্ষণাদিষু ক্রিয়াবিশেষেষু ভাণ্ডমুচ্ছুল্কং গচ্ছেৎ।) তাঁহারা রাজার ক্ষেত্র হইতে যজ্ঞার্থ বা দেবকার্য্যার্থ পুষ্প, ফল, শস্যাদি বিনামূল্যে আহরণ করিতে পারিতেন। শ্রোত্রিয় ও ব্রাহ্মণমাত্রেই বিনা শুল্কে নদী পার হইতে পারিতেন।

উপরোক্তগুলি ভিন্ন ব্রাহ্মণ, বিশেষতঃ শ্রোত্রিয়দিগের আরও কতকগুলি অধিকার ছিল। নিম্নে তাহা লিখিত হইল,—

১। উত্তরাধিকারিহীন শ্রোত্রিয়-সম্পত্তিতে রাজার অধিকার ছিল না। অন্য বর্ণের সম্পত্তি হইলে, উহা রাজকোষে গৃহীত হইত। "অদায়াদকং রাজা হরেৎ, স্ত্রীবৃত্তিপ্রেতকদর্য্য-বর্জ্জম্—অন্যত্র শ্রোত্রিয়দ্রব্যাৎ। তৎ ত্রৈবিদ্যেভ্যঃ প্রযচ্ছেৎ।"—উক্ত সম্পত্তি বেদবিৎ ব্রাহ্মণগণকেই প্রদত্ত হইত। ধর্ম্মসূত্রগুলিতেও ঐ বিধি দেখা যায়।

২। অন্য কেহ বলপূর্ব্বক বা অন্য কারণবশতঃ শ্রোত্রিয়-সম্পত্তি অধিকার করিয়া নিজ বশে রাখিলেও, অন্য বর্ণের লোকের সম্পত্তির ন্যায় শ্রোত্রিয়-দ্রব্যে ভোগজনিত অধিকার (right by adverse possession or prescriptive right) বা স্বত্ব জন্মিত না।···১৯১ পৃষ্ঠা।

"উপনিধিমাধিং নিধিং নিক্ষেপং স্ত্রিয়ং সীমানং রাজশ্রোত্রিয়দ্রব্যাণি চ।"

৩। যুদ্ধে বিজিত রাজ্যে রাজা, ব্রাহ্মণ বা শ্রোত্রিয়-দ্রব্য যথেচ্ছ ভোগ করিতে পারিতেন না। তাঁহাদিগকে উহা প্রত্যর্পণ করা হইত।

মৌর্য্য-যুগে ব্রাহ্মণ, বিশেষতঃ শ্রোত্রিয়দিগের বিশেষ অধিকার সম্বন্ধে উপরে যাহা লিখিত

* মহাশাল শব্দ অতি প্রাচীন। উপনিষদে উহার উল্লেখ আছে। টীকাকার, মহাশাল শব্দের 'মহাগৃহস্থ' এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

হইল, তাহা হইতে ব্রাহ্মণের সামাজিক প্রাধান্য বুঝা যাইবে। ব্রাহ্মণপ্রাধান্য বহু পূর্ব্বেই স্থাপিত হইয়াছিল এবং বৌদ্ধ, জৈনাদি ভিন্নধর্ম্মাবলম্বীদিগের চক্ষে উহা বিসদৃশ বলিয়া বোধ হইত। বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠাতা ক্ষত্রিয় ধর্ম্মপ্রচারকগণ ব্রাহ্মণপ্রাধান্য স্বীকার করা দূরে থাকুক, ক্ষত্রিয়গণকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেন। জাত্যভিমান ও স্ব স্ব জাতির প্রাধান্য স্থাপনের চেষ্টা কেবল ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেই ছিল না। প্রাচীন বৌদ্ধ ও জৈনগ্রন্থালোচনা করিলে বুঝা যায় যে, স্বয়ং তথাগত বুদ্ধও জাত্যভিমানবিবর্জ্জিত ছিলেন না এবং দীঘনিকায়ের অন্তর্গত অম্বষ্ঠ সূত্রে অম্বষ্ঠ নামক এক ব্রাহ্মণের সহিত কথোপকথন-ব্যপদেশে তিনি ক্ষত্রিয়ের প্রাধান্য স্থাপন করিতে যত্নবান্ হইয়াছিলেন। ঐরূপ অন্য দুই চারিটি সূত্রে দেখা যায় যে, তিনি সকল বর্ণেরই সাম্য প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং প্রসঙ্গক্রমে ব্রাহ্মণোচিত কর্ম্মের উৎকর্ষ, গুণ বা জ্ঞান-প্রাধান্যই যে প্রকৃত ব্রাহ্মণত্বের চিহ্ন, তাহা উল্লেখ করিয়াছেন। অন্য দুই এক স্থলে আবার ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় যে অন্য বর্ণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এ কথাও বুদ্ধ কর্তৃক উক্ত হইয়াছে। ( কন্নকথ্যালসুত্ত )।

ব্রাহ্মণবিদ্বেষী জৈনেরাও ব্রাহ্মণের নিকৃষ্টত্ব প্রমাণ করিবার অবসর পাইলে ছাড়িতেন না। কল্পসূত্র গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, জৈনধর্ম্মের অন্যতম প্রবর্ত্তক মহাবীর, ব্রাহ্মণী দেবনন্দার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু পাছে এ হেন অর্হতের নিকৃষ্ট গর্ভে উৎপত্তি হয়, এই ভাবিয়া দেবরাজ শক্র ( ইন্দ্র ) শুভক্ষণে অতি সন্তর্পণে গিয়া, ব্রাহ্মণীর গর্ভ হইতে ভ্রূণকে গ্রহণ করিয়া, বৈশালীর গণরাজকুমারী ত্রিশলার গর্ভে উহা স্থাপন করেন।

ফলতঃ নিরপেক্ষভাবে ব্রাহ্মণ, জৈন ও বৌদ্ধ গ্রন্থগুলি আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যদিও বৈদিক যুগেই ব্রাহ্মণের প্রাধান্যের মূলভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল, এ কথা বারংবার উক্ত হইয়াছে, তথাপি উহা একদিনে স্থাপিত ও অন্য বর্ণ, বিশেষতঃ ক্ষত্রিয়গণ কর্তৃক অনুমোদিত ও গৃহীত হয় নাই। অতি প্রাচীন যুগে দ্বিজাতি মাত্রেই বেদচর্চ্চা ও যাগ-যজ্ঞাদির অনুশীলনে যত্নবান্ ছিলেন। মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিদিগের মধ্যে অনেকে ক্ষত্রিয়। কতিপয় বৈশ্য ও অন্যূন একজন শূদ্রের নাম দেখা যায়। ক্ষত্রিয়-বৈশ্যাদির মধ্যে, শাস্ত্রজ্ঞানী অধ্যাত্মচিন্তাপরায়ণ রাজর্ষি বা মুনিদিগের অভাব ছিল না। ক্ষত্রিয়কুলে অনেক ধীমান্ দার্শনিকের জন্ম হইয়াছিল এবং সময়ে অনেক ব্রাহ্মণও এই সকল রাজর্ষির শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। এতদ্ভিন্ন অসবর্ণবিবাহের প্রচলন থাকায়, ক্ষত্রিয়রাজগণের সহিত অনেক ঋষিবংশের আদান-প্রদানও চলিত। ফলে উভয়ের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ ও নিকট ছিল।

কালক্রমে নানা কারণে উভয় বর্ণের মধ্যে মনোবিবাদের সূচনা হইয়াছিল এবং এই সকল মনোবিবাদের ফলে উভয়ের মধ্যে ভীষণ সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। মহাভারতের উদ্যোগ-পর্ব্ব, আদিপর্ব্ব ও অনুশাসনপর্ব্বের নানা স্থানে পুরাকল্পের এই সকল সংঘর্ষের কথা বারংবার উল্লিখিত হইয়াছে।

আদিপর্ব্বের এক স্থলে ( আদিপর্ব্ব, ১৭৮ অধ্যায় ) এই ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-যুদ্ধের মূল কারণের

কথা বিস্তৃতভাবে লিখিত আছে। উক্ত অধ্যায়ের উপাখ্যানটিতে বর্ণিত আছে যে—কৃতবীর্য্য-সন্তানেরা ভৃগুবংশীয়দিগের সঞ্চিত ধন আত্মসাৎ করিতে উদ্যত হইলে, উভয় পক্ষে বিরোধ উপস্থিত হয় এবং ভৃগুদিগের তিরস্কারের ফলে ক্ষত্রিয়গণ সবংশে ব্রাহ্মণদিগকে বধ করেন। সমগ্র ভৃগুবংশ তাঁহাদের হস্তে বিনষ্ট হয়; কেবল একটি ভার্গব রমণী অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করেন। কালক্রমে তাঁহার গর্ভে মহর্ষি উর্ব্বের জন্ম হয়।* ঔর্ব্বের পর ভৃগুকুলে জমদগ্নি ও তৎপুত্র পরশুরামের জন্ম হয়। পরশুরাম একুশ বার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করেন বলিয়া, পুরাণাদিতে উপাখ্যান আছে। তাহা হইতেই তৎকালে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের পরস্পরের প্রতি শত্রুতা বুঝা যায়।

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যে এই যুদ্ধ বহুকাল ধরিয়া চলিতে থাকে। তৎকালের ব্রাহ্মণেরা ধনুর্ব্বিদ্যা বা যুদ্ধবিদ্যায়ও হীন ছিলেন না এবং এই যুদ্ধে তাঁহারা অন্য বর্ণের সাহায্য প্রাপ্ত হন বলিয়া বোধ হয়। বস্তুতঃ উদ্যোগপর্ব্বের এক স্থানে ব্রাহ্মণগণ যে বৈশ্যশূদ্রাদির নেতৃত্ব লাভ করিয়া, তাহাদের সাহায্যে ক্ষত্রিয়দিগের সহিত যুদ্ধ করিতেন, তাহার উল্লেখ পাওয়া যায়। ক্ষত্রিয়েরাও বহুকালব্যাপী যুদ্ধের ফলে হীনবল হইয়া পড়েন এবং কালক্রমে ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য স্বীকার করিতে বাধ্য হন। যাহা হউক, অর্থশাস্ত্রের সময় ব্রাহ্মণপ্রাধান্য স্থাপিত হয় এবং অর্থশাস্ত্রে তাঁহাদের যে কতকগুলি বিশেষ অধিকারের উল্লেখ দেখা যায়, সেগুলি পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

ব্রাহ্মণের পর ক্ষত্রিয়দিগের কথা। ক্ষত্রিয়েরাও সমাজে ব্রাহ্মণদিগের নিম্নে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিতেন। অর্থশাস্ত্রে ক্ষত্রিয়দিগের স্বধর্ম্ম ও কর্ত্তব্যের বিশেষ উল্লেখ দেখা যায় এবং তাঁহাদেরও কতকগুলি অধিকারের উল্লেখ আছে। তাঁহাদের সামাজিক স্থান ঠিক ব্রাহ্মণের নিম্নে হওয়ায়, অর্থদণ্ড-স্থলে তাঁহাদিগকে অন্য বর্ণাপেক্ষা অল্প দণ্ড দেওয়া হইত। বাক্‌পারুষ্য স্থলে ক্ষত্রিয়কে অবমাননা করিলে বৈশ্য-শূদ্রাদি অপেক্ষা অধিকতর দণ্ড দিতে হইত। ক্ষত্রিয়কে দাসরূপে বিক্রয় করিলে অপরাধীকে তিন গুণ অর্থদণ্ড দিতে হইত। এইরূপ সামাজিক মর্য্যাদা-হিসাবে আইনের চক্ষে ক্ষত্রিয়ের স্থান ব্রাহ্মণের নিম্নেই ছিল। ক্ষত্রিয়া রমণীর বিবাহ বা পুনর্ব্বিবাহ বিষয়ে বিশেষ বিধি ছিল। কৌটিল্য যোদ্ধৃবর্গের মধ্যে ক্ষত্রিয়বলের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহার

---

* ততো মহীতলং তাত! ক্ষত্রিয়েণ যদৃচ্ছয়া।
খনতাধিগতং বিত্তং কেনচিদ্ভৃগুবেশ্মনি।
তদ্‌বিত্তং দদৃশুঃ সর্ব্বে সমেতাঃ ক্ষত্রিয়র্ষভাঃ।
অবমন্য ততঃ ক্রোধাদ্‌ভৃগূংস্তান্ শরণাগতান্।
নিজঘ্নুঃ পরমেষ্বাসাঃ সর্ব্বাংস্তান্ নিশিতৈঃ শরৈঃ।
আগর্ভাদবকৃন্তন্তশ্চেরুঃ সর্ব্বাং বসুন্ধরাম্।
তত উচ্ছিদ্যমানেষু ভৃগুষেবং ভয়াৎ তদা।
ভৃগুপত্ন্যো গিরিং দুর্গং হিমবন্তং প্রপেদিরে।
তাসামন্যতমা গর্ভং ভয়াদ্দধ্রে মহৌজসম্।

—মহাভারত, আদিপর্ব্ব—১৭৮ অধ্যায়।

মতে ব্রাহ্মণাপেক্ষা "প্রহরণবিদ্যাবিনীতে তু ক্ষত্রিয়বলং শ্রেয়ঃ।"—অর্থাৎ, প্রহরণবিদ্যাকুশল ক্ষত্রিয় সৈন্যই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট—( ৩৩০ পৃষ্ঠা )।

উপরোক্ত বিষয়গুলি ভিন্ন অর্থশাস্ত্রে ক্ষত্রিয়দিগের সম্বন্ধে আর বিশেষ উল্লেখ নাই। ইহার কারণস্বরূপ এই কথা বলা যাইতে পারে যে, মৌর্য্যযুগ ক্ষত্রিয়শক্তির অবসাদ বা অবসানের সময়। ভারতযুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গেই ক্ষত্রিয়শক্তি একেবারে দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। কালক্রমে অবশিষ্ট ক্ষত্রিয়রাজগণের অধিকার ও প্রাধান্য ক্রমে হ্রাস হইতে থাকে এবং ক্ষত্রিয়েতর রাজগণের প্রাধান্য বাড়িতে থাকে। বুদ্ধের সময় দেখা যায় যে, ক্ষত্রিয়াভিমানী শাক্যেরা কোশলরাজ ও মগধরাজকে উচ্চকুলোদ্ভব ক্ষত্রিয় বলিয়া গণ্য করিতেন না এবং তাঁহাদের সহিত কন্যার বিবাহ দিতে কুণ্ঠিত হইতেন। বৌদ্ধগ্রন্থ হইতেও জানা যায় যে, কোশলরাজ প্রসেনজিৎ শাক্যরাজকুমারীর পাণি-প্রার্থী হইলে, তাঁহাকে এক দাসীগর্ভজাতা কুমারী সমর্পণ করা হয়। এই শাক্যবংশীয়া দাসীগর্ভজাতা রাজকন্যার গর্ভে পরিণামে প্রসেনজিতের বিড়ূঢ়ভ নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। মাতুলালয়ে অবমানিত হইয়া, কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, মাতার জন্মবৃত্তান্ত অবগত হইয়া, ইনি ক্রোধে সমস্ত শাক্যবংশের উচ্ছেদসাধন করেন। ইহার কিছুকাল পরে মগধে শিশুনাগবংশের অবসান হয় এবং শিশুনাগবংশীয় শেষ রাজা নন্দের শূদ্রাপত্নীগর্ভজাত পুত্র মহাপদ্ম নন্দ মগধের সাম্রাজ্য লাভ করেন। বিষ্ণুপুরাণে এই মহাপদ্ম নন্দ "পরশুরাম ইব দ্বিতীয়ক্ষত্রিয়ান্তকারী" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন এবং উক্ত পুরাণের মতে অতঃপর শূদ্র ভূপালদিগের রাজত্ব হইবে, এই কথা উল্লিখিত হইয়াছে। নন্দেরা শূদ্রাগর্ভজাত ও ক্ষত্রিয়দ্বেষী ছিলেন। তাঁহারা ঠিক শূদ্র বলিয়া পরিগণিত হইতেন কি না, তাহা ঠিক বুঝা যায় না। বোধ হয়, শূদ্রাগর্ভজাত বলিয়া অন্য ক্ষত্রিয়দিগের উপহাসাস্পদ হওয়ায়, তাঁহারা অনেক ক্ষত্রিয়বংশের উচ্ছেদ করেন। কিন্তু নিজেরা বোধ হয়, আভিজাত্যের দাবী করিতে ছাড়িতেন না। মুদ্রারাক্ষসে নন্দরাজকে উচ্চবংশীয় বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থ নন্দ বা মৌর্য্যদিগের রচিত না হইলেও বোধ হয়, গ্রন্থকার তাঁহার সময়ে প্রচলিত কোন ইতিবৃত্ত বা কিংবদন্তী হইতেই ঐরূপ সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়াছিলেন। উক্ত গ্রন্থের ষষ্ঠ অঙ্কে মন্ত্রিপ্রবর রাক্ষস, উচ্চকুলসম্ভূত নন্দরাজকে ত্যাগ করিয়া চন্দ্রগুপ্তকে আশ্রয় করায়, লক্ষ্মীকে নীচগামিনী কুলটা বলিয়া তিরস্কার করিয়াছেন। যথা,—

"পতিং ত্যক্ত্বা দেবং ভুবনপতিমুচ্চৈরভিজনং
গতা ছিদ্রেণ শ্রীর্বৃষলমবিনীতেব বৃষলী।"

আর এক স্থলেও ঐরূপ রাক্ষস, মৌর্য্যকে পাপ ও কুলহীন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন,—

"পৃথিব্যাং কিং দগ্ধাঃ প্রথিতকুলজা ভূমিপতয়ঃ
পতিং পাপে মৌর্য্যং যদসি কুলহীনং বৃতবতী।"

এই সকল হইতে নন্দবংশীয়গণকে উচ্চবংশজ বা ক্ষত্রিয় বলিয়া বোধ হয়।

এই নন্দবংশীয় কোন রাজপুত্রের দাসীগর্ভে আবার মৌর্য্যরাজ চন্দ্রগুপ্তের জন্ম। মৌর্য্য-বংশীয়দিগের শূদ্রত্ব সম্বন্ধে সকল গ্রন্থকারই একমত। শূদ্ররাজদিগের আধিপত্যকালে ক্ষত্রিয়-

দিগের যে প্রাধান্য হ্রাস হইবে, তাহা বুঝা যায়। চন্দ্রগুপ্তের সময় সমস্ত উত্তর-ভারত মৌর্য্যরাজ-গণের অধীন ছিল। তাঁহার সময়ে কোন ক্ষত্রিয় রাজা বা রাজবংশের উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে অর্থশাস্ত্রের সঙ্ঘবৃত্তাধ্যায়ে কম্বোজ ও সুরাষ্ট্রদেশবাসী ক্ষত্রিয়শ্রেণীর উল্লেখ পাওয়া যায়। ইঁহারা বার্ত্তাশাস্ত্রোপজীবিনঃ, অর্থাৎ পশুপালন, কৃষিকার্য্য, বাণিজ্য ও অস্ত্রব্যবসায়ের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। উক্ত অধ্যায়ে লিচ্ছিবিক, বৃজিক, মল্ল, মদ্র, কুকুর ও পাঞ্চালবংশীয় ক্ষত্রিয়-দিগের উল্লেখ আছে। অর্থশাস্ত্রের সময় ইঁহারা রাজশব্দোপজীবী অর্থাৎ প্রজাদিগের দ্বারা নির্ব্বাচিত গণরাজদিগের অধীন ছিলেন। এই কয়টি কথা ভিন্ন ক্ষত্রিয়দিগের সম্বন্ধে আমরা আর বিশেষ কিছু জানিতে পারি না। মৌর্য্যরাজগণের সময় এই সকল ক্ষত্রিয়শ্রেণীগুলি বিশেষ ক্ষমতাপন্ন ছিল, বলিয়া বোধ হয় না।

অতঃপর বৈশ্যদিগের কথা। বৈশ্যেরা কৃষি, বাণিজ্য, পশুপালন প্রভৃতি কার্য্যের দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন। বুদ্ধের জীবন-সময়ে ও মৌর্য্যযুগের অব্যবহিত পূর্ব্বে বৈশ্য-শ্রেষ্ঠী বা মহাজনদিগের অবস্থা অতিশয় উন্নত ছিল। প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে এই সকল কোটিপতি বণিক্‌দিগের অতুল ঐশ্বর্য্যের কথা বর্ণিত আছে এবং তাঁহাদিগের দানের কথা বহু স্থানে উল্লিখিত আছে। ইহা হইতেই মনে করা যায় যে, মৌর্য্যযুগেও ইঁহাদিগের অবস্থা মন্দ ছিল না। তবে অর্থশাস্ত্র ও অন্য কতিপয় সমসাময়িক গ্রন্থ হইতে বুঝা যায় যে, নানা কারণে ইঁহারা রাজা ও প্রজা উভয়ের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। বোধ হয়, দেশের অধিকাংশ মূলধন ইঁহাদিগের হস্তগত হওয়ায় এবং ইঁহারা ইচ্ছামত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি করায়, প্রজাসাধারণের পক্ষে বিশেষ কষ্টকর হইয়াছিল এবং ইহারই ফলে মৌর্য্যরাজগণের সময় বণিক্‌দিগের দমনের জন্য অনেকগুলি কঠোর আইনের সৃষ্টি হইয়াছিল। অর্থশাস্ত্রকার কৌটিল্য বণিক্‌দিগকে "চোরান্ অচোরাখ্যান্" অর্থাৎ অচোর সাধুর বেশে প্রজাদিগের সর্ব্বস্বাপহারী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অর্থশাস্ত্রে বণিক্‌দিগের অতিরিক্ত লাভ গ্রহণ দূষণীয় ছিল ( স্থূলমপি চ লাভং প্রজানামৌপঘাতিকং বারয়েৎ।—৯৮ পৃষ্ঠা ) এবং পাছে তাঁহারা অতিরিক্ত মূল্য বৃদ্ধি করিয়া প্রজাদিগকে উৎপীড়িত করেন, এই জন্য রাজ-কর্ম্মচারীরা পণ্যের ক্রয়মূল্যের উপর লাভের অংশ নির্ণয় করিয়া বিক্রয়মূল্য নির্দ্ধারিত করিয়া দিতেন। বর্ত্তমানে ব্যবসায়ীদিগের অত্যাচারের ফলে অন্নবস্ত্রাদির মহার্ঘতার জন্য আমাদের দেশের যেরূপ শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে, তাহাতে এইরূপ কোন ব্যবস্থা থাকিলে বিশেষ ভাল হইত এবং দারিদ্র্য ও অভাবজনিত অনেক অশান্তিই নিবারিত হইত। মোটের উপর মনে হয়, বণিক্‌দিগের আর্থিক অবস্থা মন্দ ছিল না। সমাজে ও আইনের চক্ষে ইঁহাদের স্থান ক্ষত্রিয়দিগের নিম্নেই ছিল।

আর্য্য-সমাজের সর্ব্বনিম্নেই ছিল শূদ্রদিগের স্থান। অর্থশাস্ত্রের এক স্থলে শূদ্রদিগকেও আর্য্য বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। শূদ্রেরা সাধারণতঃ কৃষি ও কারুকার্য্যের দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহাদিগের অবস্থাও ভাল ছিল। চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজে সাম্যবাদের অভাবের ফলে যদিও তাঁহারা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের ন্যায় বিশেষ অধিকারে বঞ্চিত এবং আইনত অপরাধস্থলে কঠোরতর

দণ্ডে দণ্ডিত হইতেন। তথাপি তাঁহাদের আর্থিক ও নৈতিক অবস্থা মন্দ ছিল না এবং যদিও দণ্ডসমতা ও ব্যবহার-সমতার অভাবে সময়ে সময়ে তাঁহাদিগকে যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত, তথাপি বিবাহ-বিধি, দায়-বিভাগ, দ্রব্যাদির ক্রয়-বিক্রয় প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহাদিগের বিশেষ কোন নৈতিক বাধা (disqualification) ছিল না। অন্য বর্ণের ন্যায় তাঁহারা যথেচ্ছ পণ্যদ্রব্যাদি ক্রয়-বিক্রয় করিতে পারিতেন, বৃত্তির জন্য দেশের এক স্থান হইতে অন্য আর এক স্থানে গমন করিতে পারিতেন এবং ইচ্ছামত বেতনের চুক্তি করিয়া কার্য্য গ্রহণ করিতে পারিতেন। তাঁহাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় কেহ হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেন না বা তাঁহাদিগকে ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে পারিতেন না। অর্থশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, শূদ্রপ্রায় জনসাধারণের (masses) প্রতি কৌটিল্যের বিশেষ সহানুভূতি ছিল এবং ইহাদিগের রক্ষা ও উন্নতিকল্পে কৌটিল্য ও তৎপ্রবর্ত্তিত শাসন-প্রণালীর রাজকর্ম্মচারীরা বিশেষ যত্নবান্ হইতেন। নূতন গ্রাম বা নগর স্থাপিত হইলে শূদ্রদিগকে আহ্বান করিয়া চাষের জন্য জমি দেওয়া হইত এবং রাজকোষ হইতে বীজ-ধান্য ও কিছু টাকা অগ্রিম দেওয়া হইত। মহাজনদিগের হস্ত হইতে রক্ষার জন্য সুদের হার সরকার হইতে নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়া হইত এবং কৃষিকার্য্য বা শস্য সংগ্রহের সময় যাহাতে ইহাদিগকে ঋণদায়ে বা অন্য কোন অপরাধবশতঃ কারাদণ্ডে দণ্ডিত না হইতে হয়, তাহারও বিশেষ বিধি ছিল।

ভূমিহীন শূদ্রদিগের অনেকে অন্যের চাকুরী করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে ইহাদিগের কথা উল্লিখিত হইবে। কর্ম্মকর, কারু ও শিল্পজীবীদিগের অধিকাংশই নিজ নিজ শ্রেণী বা গণের নিয়মানুযায়ী হইয়া থাকিতেন। এই সকল শ্রেণীর কথা পরে বর্ণিত হইবে। শ্রেণীগুলি নির্ব্বাচিত গণমুখ্য বা শ্রেণীমুখ্য গণদ্বারা পরিচালিত হইত। প্রত্যেক শ্রেণীই নিজ নিজ সুবিধার জন্য কতকগুলি নিয়ম (regulations) প্রবর্ত্তিত করিতে পারিতেন। শ্রেণীর সভ্যদিগের মধ্যে কোন কারণে মনোবাদ উপস্থিত হইলে শ্রেণীমুখ্যেরা উহার বিচার করিতেন। অপরাধীদিগকে অর্থদণ্ড বা অন্য কোন দণ্ডে দণ্ডিত করিতে পারিতেন। অর্থশাস্ত্রের সময় তন্তুবায়, সূত্রধর, মণিকার, ধাতুদ্রব্যনির্ম্মাতা, কুশীলব, কৃষক প্রভৃতি সকলেই নিজ নিজ শ্রেণীভুক্ত ছিল। মৌর্য্যযুগে এই সকল শ্রেণীর পরিচালনের জন্য কয়েকজন রাজকর্ম্মচারী লইয়া ( মূলে অমাত্য বা প্রদেষ্টা ) একটি সমিতি গঠিত ও স্থাপিত হইয়াছিল। বোধ হয়, পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে শ্রেণীদিগের যে প্রাধান্য ও ক্ষমতা ছিল, তাহা কিছু খর্ব্ব করিবার জন্যই এই রাজ-নিযুক্ত সমিতির প্রবর্ত্তন হয়।

উপরিলিখিত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ভিন্ন দেশে চণ্ডালাদি অন্ত্যজ জাতি ও কিরাতাদি নানা প্রকার বন্য জাতীয় লোক ও ম্লেচ্ছদিগেরও বাস ছিল। ইহারা চাতুর্ব্বর্ণ্য আর্য্য-সমাজের অন্তর্গত বলিয়া গণ্য হইত না। সাধারণতঃ লোকালয়ের বাহিরে ইহাদের স্থান ছিল। গ্রাম ও নগরাদির বর্ণনা-প্রসঙ্গে ইহাদের সম্বন্ধে আরও কিছু বলা হইবে।

অতঃপর এখানে প্রসঙ্গক্রমে দাসদের কথা বলা হইবে। ইহারা ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অভাব-বশতঃ কোন বর্ণ বা জাতিবিশেষের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। ইহারা স্বতন্ত্রভাবে পরিগণিত হইত।

অতি প্রাচীন কালে অর্থাৎ বৈদিক যুগেই আর্য্যসমাজে দাসদিগের উল্লেখ দেখা যায়। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা বলেন যে, বিজিত অনার্য্যগণই দাসরূপে হিন্দু-সমাজে গৃহীত হন। এ মতটি কত দূর সত্য, তাহা বলা যায় না। কেন না, প্রাচীন রোমক, গ্রীক্ ও টিউটন-সমাজে ও অন্যান্য প্রাচীন সমাজমাত্রেই দাসত্ব-প্রথার প্রচলন দেখা যায়। ঐ সকল সমাজে সাধারণতঃ বিজিত শত্রুকে দাসরূপে কার্য্যে নিয়োজিত করা হইত। আবার টিউটন প্রভৃতিদিগের মধ্যে গুরুতর অপরাধেও লোকের স্বাধীনতা হরণ করিয়া, তাহাকে দাসে পরিণত করা হইত। কালক্রমে আবার দারিদ্র্যের পীড়নে অনেক লোক আত্ম-স্বাধীনতা বিক্রয় করিয়া, পরের দাসত্ব স্বীকার করিত। কার্থেজিনিয়ান, ফিনিসিয়ান ও অন্যান্য কতিপয় সমাজে সকল প্রকার পরিশ্রমের কার্য্য দাসদিগের উপর চাপান হইত। তাহাদিগকে পশুর মত খাটাইয়া সমাজের যাহা কিছু প্রয়োজনীয় কার্য্য, তাহা করান হইত। এই সকল কারণে ঐ সকল সমাজে দাসদিগের বিশেষ প্রয়োজন ছিল এবং দাস-সংখ্যা পূরণ ও বৃদ্ধির জন্য কার্থেজিনীয় ও ফিনিশীয় জলদস্যুরা ভূমধ্যসাগরের উপকূলবর্ত্তী নানা স্থান লুণ্ঠন করিয়া, তত্রত্য অধিবাসীদিগকে দাসত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ করিতে কুণ্ঠিত হইত না। গ্রীক্‌দিগের মধ্যে বিজিত শত্রুকে দাসরূপে গ্রহণ করিয়া, প্রাণবধের পরিবর্ত্তে তাহাদিগকে পশুত্বে পরিণত করা হইত। প্রাচীন রোমকদিগের মধ্যেও রাজ্য জয়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিশ্রম-পরাঙ্মুখতা ও বিলাসিতা-বৃদ্ধির সহিত অসংখ্য দাস রাখিবার প্রথা প্রচলিত হয়। এই সকল দাসের অধিকাংশই পশ্চিম এসিয়া, আফ্রিকার উত্তর প্রদেশ ও ইউরোপ হইতে গৃহীত হইত। টিউটন, গল, সাইবিরিয়, গথ, বিজিত গ্রীক্, দেশীয় (Dacian) লিবীয়ান, শ্লাভ্, নিগ্রো প্রভৃতি নানা জাতীয় দাসে রোমক সাম্রাজ্য ছাইয়া গিয়াছিল। রোমকদিগের কৃষিক্ষেত্রগুলি অধিকাংশই দাসদিগের দ্বারা পরিচালিত হইত। ঐরূপ বস্ত্রবয়ন, শিল্পকার্য্য প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যের জন্য দাসের প্রয়োজন ছিল। ইহাদের সংখ্যা এত অধিক হইয়াছিল যে, সময়ে সময়ে ইহাদের বিদ্রোহ দমনের জন্য প্রদেশসমূহে বিশাল বাহিনী প্রেরিত হইত। উহাদিগের সাহায্যে অতি কষ্টে রক্তস্রোত বহিয়া গেলে দাস-বিদ্রোহ নিবারিত হইত।

রোম ও গ্রীক্ প্রভৃতির চক্ষে দাসেরা মনুষ্য বলিয়া পরিগণিত হইত না। তাহাদিগকে দ্রব্য বলিয়া (res) বিবেচনা করা হইত। প্রভু ইচ্ছামত দাসকে প্রহার করিতে, দণ্ড দিতে, বিকলাঙ্গ করিতে, এমন কি, মারিয়া ফেলিতেও পারিতেন। তাহাদিগের কোন অধিকার বা সম্পত্তি রাখিবার ক্ষমতা ছিল না। দাসের উপার্জ্জিত সমস্ত সম্পত্তি—এমন কি, তাহার সন্তান-সন্ততিও প্রভুর বলিয়া পরিগণিত হইত। পরবর্ত্তী যুগে অবশ্য ইহার প্রতিকার-চেষ্টা হয় এবং কতিপয় সহৃদয় রোমক সম্রাটের অনুকম্পায় দাসদিগের অবস্থা উন্নীত হইয়াছিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভারতে দাসত্ব-প্রথা অতি প্রাচীন কাল হইতেই প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। বৌদ্ধ ধর্ম্মের উৎপত্তির সময় রচিত পালি ও অন্যান্য গ্রন্থ হইতে আমরা যাহা জানিতে পারি, তাহাতে প্রতীয়মান হয় যে, অনার্য্য ও বিজিত শত্রু ভিন্ন আর্য্যবংশীয় লোকেও নানা কারণে দাসরূপে পরিণত হইতেন। যুদ্ধের ফলে দাসত্ব ভিন্ন নিম্নে কয়েকটি কারণ দেওয়া গেল,—

দাস ও দাসত্ব-প্রথা।

*(১) ঋণের দায়ে অনেকে দাসত্ব স্বীকার করিতে বা নিজ নিজ স্ত্রী-পুত্রকে বিক্রয় করিতে বাধ্য হইত। আর্য্য-সমাজেও ইহার অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। আমাদের মহাভারতে হরিশ্চন্দ্রের স্ত্রী-পুত্র ও আত্মবিক্রয়ের কথা সকলেই অবগত আছেন। থেরীগাথা নামক পালি গ্রন্থে আছে যে, মৌর্য্য-যুগের অব্যবহিত পূর্ব্বে রচিত ইসিদাসী নাম্নী থেরীর আত্মজীবনীর শেষভাগে —যে ভাগে তাঁহার পূর্ব্বখণ্ডের কথা বিবৃত আছে, সেই অংশ পাঠে জানা যায় যে, ইসিদাসী পূর্ব্ব-জন্মে কোন এক দরিদ্র শকট-চালকের কন্যা হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। শকট-চালক কোন বণিকের নিকট ঋণ করিয়াছিলেন এবং যথাকালে উক্ত ঋণ সুদসমেত পরিশোধ করিতে না পারায়, বণিক্ বলপূর্ব্বক তাঁহার কন্যাকে ধরিয়া লইয়া যান এবং বোধ হয়, দাসীত্বে নিযুক্ত করেন। কালে ঐ কন্যার প্রতি বণিকের পুত্রের আসক্তি জন্মে। মূলটি এই,—

তিংসতিবস্সম্হি মতো সাকটিককুলম্হি দারিকা জাতা।
কপণম্হি অপ্পভোগে ধনিকপুরিসপাতবহুলম্হি ॥ ৪৪৩ ॥
তং মং ততো সত্থবাহো উস্সন্নায় বিপুলায় বড্‌ঢিয়া।
ওকড্‌ঢতি বিলপন্তিং অচ্ছিন্দিত্বা কুলঘরস্স ॥ ৪৪৪ ॥

(২) স্বেচ্ছায় আত্মবিক্রয়ের উদাহরণ—প্রাচীনতম বৌদ্ধগ্রন্থ বিনয়পিটকের দুই স্থলে দেখা যায় —(প্রথম খণ্ড, ১৬৮, ১৯১)।

(৩) উৎকট পাপ বা অপরাধের ফলে অনেকের স্বাধীনতা অপহরণ করার বিধি ছিল—অর্থশাস্ত্রেও এরূপ বিধি দেখা যায়। উচ্চ বর্ণের স্ত্রীলোক স্বেচ্ছায় কুলটা বা দুশ্চরিত্রা হইলে তাহার স্বাধীনতা হরণ করিয়া, তাহাকে রাজার দাসীতে পরিণত করা হইত। "স্বয়ংপ্রকৃতা রাজদাস্যং গচ্ছেৎ॥" জাতকেও বর্ণনাপ্রসঙ্গে ঐরূপ একটি উদাহরণ পাওয়া যায়। পরবর্ত্তী যুগে এই সকল কারণে দাসত্ব ঘটিত। বৌদ্ধ ধর্ম্মের উৎপত্তির সময় দাসদিগের সন্তান-সন্ততিও দাস বলিয়া পরিগণিত হইত। বৌদ্ধ ধর্ম্মে দাসদিগের উন্নতিকল্পে কোন চেষ্টা দেখা যায় না। তাঁহারা দাসকে মানুষ জ্ঞান করিতেন না এবং দাসদিগকে বৌদ্ধ সঙ্ঘে প্রবেশ করিতে দিতেন না। অন্যান্য ধর্ম্ম-প্রচারকেরা বোধ হয়, দাসদিগের প্রতি অনুকূল ছিলেন এবং উঁহাদিগকে সঙ্ঘে প্রবেশাধিকার দিয়াছিলেন। যে সকল দাস কোন ধর্ম্মসঙ্ঘে প্রবেশ করিতে পারিত, তাহারা দাসত্বপাশ হইতে মুক্ত হইত।

অর্থশাস্ত্রের সময় দাসদিগের অবস্থা বিশেষ উন্নত হইয়াছিল। কৌটিল্যও বোধ হয়, তৎপূর্ব্ববর্ত্তী নীতিকারদিগের প্রবর্ত্তিত নীতি অনুসারে আত্মবিক্রয়ী ভিন্ন অন্য কেহ কাহাকেও দাসরূপে বিক্রয় করিলে বিশেষ দণ্ডার্হ হইবেন, এইরূপ বিধি প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। কেহ নিজ পুত্রকেও দাসরূপে বিক্রয় করিতে পারিতেন না। কৌটিল্য বলেন,—"উদরদাসবর্জ্জমার্য্যপ্রাণমপ্রাপ্তব্যবহারং শূদ্রং বিক্রয়াধানং নয়তঃ স্বজনস্য দ্বাদশপণো দণ্ডঃ, বৈশ্যং দ্বিগুণঃ, ক্ষত্রিয়ং ত্রিগুণঃ, ব্রাহ্মণং চতুর্গুণঃ—পরজনস্য পূর্ব্বমধ্যমোত্তমবধা দণ্ডাঃ ক্রেতৃশ্রোতৄণাং চ।"

অর্থশাস্ত্রের সময় রাজনৈতিকেরা ও ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকেরা সমাজের দাসত্ব-প্রথাকে অতি ঘৃণার

চক্ষে দেখিতেন এবং উহা ঘৃণিত ম্লেচ্ছ জাতিরই যোগ্য—আর্য্যের পক্ষে অতি দূষণীয় বলিয়া জ্ঞান করিতেন। কৌটিল্য বলেন,—"ম্লেচ্ছানামদোষঃ প্রজাং বিক্রেতুমাধাতুং বা। ন ত্বেবার্য্যস্য দাসভাবঃ।" অর্থাৎ ম্লেচ্ছেরা পুত্রাদি বিক্রয় করিয়া বা বন্ধক দিয়া থাকে।

দাসত্ব-প্রথার উচ্ছেদকল্পে দাস-বিক্রয়ীকে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করার ব্যবস্থা হয়। এমন কি, জ্ঞাতা শ্রোতা সকলকেই দণ্ডিত করা হইত। এই সকলের ফলে দাস-বিক্রয় একেবারে উঠিয়া যায়। যাহারা দাস রহিয়া গেল, তাহাদেরও অবস্থার বিশেষ উন্নতি হইয়া গেল। এই সকল কঠোর শাসন-নীতির ফলে ভারতীয় দাস নিম্নলিখিত অধিকার লাভ করিয়াছিল,—

১। নিজ নিজ পৈতৃক বা উত্তরাধিকার-সূত্রে সম্পত্তি লাভ করিয়া, উহাতে স্বত্ববান্ হইতে পারিত। "আত্মাধিগতং স্বামিকর্ম্মাবিরুদ্ধং লভেত, পৈত্র্যং চ দায়ম্।"

২। নিষ্ক্রয় মূল্য সংগ্রহ করিয়া নিজ স্বাধীনতা ক্রয় করিতে পারিত। "মূল্যেন চার্য্যত্বং গচ্ছেৎ।" কৌটিল্য আরও বলেন যে, দাস-প্রভু নিষ্ক্রয়-মূল্য পাইলে দাসকে স্বাধীনতা দিতে বাধ্য ছিলেন; না দিলে দণ্ডার্হ হইত। "দাসমনুরূপেণ নিষ্ক্রয়েণার্য্যমকুর্ব্বতো দ্বাদশপণো দণ্ডঃ।"

৩। প্রভু কর্তৃক নীচ কার্য্যে নিযুক্ত হইলে বা উৎপীড়িত হইলে, রাজপুরুষের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া স্বাধীন হইতে পারিত।

৪। দাসের সম্পত্তি তাহার উত্তরাধিকারিগণেরই প্রাপ্য ছিল। তদভাবে দাসস্বামী উহা পাইত।

৫। প্রভু অত্যাচার করিলে রাজার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, উহাকে সমুচিত দণ্ডে দণ্ডিত করিতে পারিত।

৬। ক্রীতদাসীরা বলাৎকার স্থলে সদ্যঃ মুক্তিলাভ করিত এবং প্রভুর, ঔরসে উহাদের সন্তান জন্মিলে, উহারা সম্পত্তির অংশভাগী হইত।

৭। কেহ আত্মবিক্রয় করিলে উহার সন্তানাদি স্বাধীনই থাকিত।

এই সকল বিধির ফলে অবশিষ্ট দাসদিগের অবস্থা এত ভাল হইয়াছিল যে, গ্রীক্‌পর্য্যটকদিকের চক্ষে ভারতে দাসত্ব-প্রথার অস্তিত্বই বোধগম্য হয় নাই এবং গ্রীক্‌রাজদূত মেগাস্থিনিশ বলিয়া গিয়াছেন যে, ভারতীয় একটি মহত্তর বিষয় এই যে, তাঁহাদের মধ্যে সকলেই স্বাধীন এবং দাস বলিয়া কেহ ভারতীয় সমাজে ছিল না। বিখ্যাত ঐতিহাসিক আরিয়ানও ঐ মত উদ্ধার করিয়া সমর্থন করিয়াছেন এবং বলিয়া গিয়াছেন যে, স্পার্টানদিগের ন্যায় ভারতবাসীরাও স্বজাতীয় কাহাকেও দাসত্বে পরিণত করেন না। তবে ভারতবাসীদিগের মহত্ত্ব এই যে, তাঁহারা স্বাধীনতা হরণ করিয়া কাহাকেও দাসত্বে নিযুক্ত করেন না। বিদেশীর মুখে, বিশেষতঃ আত্মাভিমানী সুসভ্য গ্রীকের মুখে এই প্রশংসা আমাদের কম গৌরবের কথা নহে।

যে যুগে ইউরোপের প্রধানতম রাজনৈতিক ও দার্শনিক আরিষ্টটল দাসত্ব-প্রথার সমর্থন করিয়াছেন এবং প্রাণদানের পরিবর্ত্তে স্বাধীনতা হরণ দোষাবহ নহে, বরং সমাজের পক্ষে মঙ্গলকর —এই মত প্রচার করিয়াছেন, সেই যুগেই ভারতীয় রাজনৈতিক মহামতি কৌটিল্য দাসত্ব-প্রথাকে

বর্ব্বরোচিত বলিয়া ঘৃণার চক্ষে দেখিয়াছেন এবং আর্য্যসমাজভুক্ত ব্যক্তিসাধারণের স্বাধীনতা প্রচার করিয়া গিয়াছেন। ইহা হইতে বুঝা যাইবে যে, প্রাচীন ভারতীয় সামাজিক আদর্শ কত উচ্চ ছিল এবং এই নৈতিক ও সামাজিক উচ্চ আদর্শের ফলে ভারতবাসী সভ্য পাশ্চাত্য বিদেশীর চক্ষে কি উন্নত ও উদার বলিয়া প্রতীয়মান হইতেন। ( Comp. Aristotle on slavery ; Politics, I.)

দাস ভিন্ন আর এক শ্রেণীর লোকের কথা অর্থশাস্ত্রে পাওয়া যায়। ইহাদিগকে অহিতক নামে অভিহিত করা হইয়াছে। অহিতকদিগের সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না।

অহিতক ভিন্ন গ্রামভৃতক শ্রেণীর লোকের প্রকৃত অবস্থা নির্ণয় করা কঠিন। ইহারা গ্রামের ভৃত্য ও গ্রামের সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইত। ইহাদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে এই মাত্র বলিতে পারা যায় যে, তাহারা সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন ছিল না। বোধ হয়, ইহারা গ্রামের জমি ভোগ করিত ও গ্রামের লোকের কার্য্য করিত। ইহাদিগকে রুস দেশীয় Serfদিগের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

# নারায়ণপালের লিপি

( সাহিত্য-পরিষদের চিত্রশালায় রক্ষিত )

এই লিপিখানি একটি পিত্তল-মূর্ত্তির পশ্চাদ্‌ভাগে উৎকীর্ণ। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার বাঙ্গালার ইতিহাসে সর্ব্বপ্রথম এই লিপির উল্লেখ করেন এবং পাদটীকায় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ মহাশয় কৃত পাঠ উদ্ধৃত করেন[১]। তৎপর ইণ্ডিয়ান এণ্টিকোয়েরী পত্রে শ্রীযুক্ত রাখাল বাবু পুনরায় এই লিপির বিবরণ জ্ঞাপন করেন এবং সংশোধিত পাঠ প্রকাশিত করেন[২]।

রাখাল বাবু যখন প্রথম এই মূর্ত্তির উল্লেখ করেন, তখন ইহা শ্রীযুক্ত চিত্তসুখ সান্ন্যাল মহাশয়ের নিকট ছিল। সম্প্রতি ইহা সাহিত্য-পরিষদের চিত্রশালায় রক্ষিত আছে।

লিপিখানি মূর্ত্তির পশ্চাদ্‌ভাগের ফ্রেমের চারি দিকে ঘুরাইয়া লেখা। আমি ইহা নিম্নলিখিতরূপে পাঠ করিয়াছি।

| | | |
|---|---|---|
| ১। | ওঁ দে(য়ধর্ম্মো)য়ং শ্রীনারায় | ( বাম দিকে ) |
| ২। | ণ পাল দেব রাজ্যে | ( উপরের দিকে ) |
| ৩। | সম্বৎ ৫৪ । | ( ডান দিকে ) |
| ৪। | শ্রী উদণ্ড পু | ( নীচের দিকে ) |
| ৫। | র বুধায়। পালক উ চ | |
| ৬।. | পুত্র ঠারুকস্য | |

প্রথম পঙ্‌ক্তির 'দেয়ধর্ম্মোয়ং' কথাটির মাত্র 'দ', 'ম', ও 'য়' পড়া যায়। অবশিষ্ট মুছিয়া গিয়াছে। ষষ্ঠ পঙ্‌ক্তির 'পু'এর হ্রস্ব উকার, 'ত্র'এর 'র'-ফলা ও 'স্য'এর য-ফলা অস্পষ্ট।

পঞ্চম পঙ্‌ক্তি ব্যতীত লিপিখানির অন্য অংশের পাঠ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ বাবু ও শ্রীযুক্ত রাখাল বাবু যাহা পাঠ করিয়াছেন, আমিও তাহাই পাঠ করিয়াছি। যত গোল পঞ্চম পঙ্‌ক্তির পাঠ সম্বন্ধে। প্রথম অক্ষরটি নিঃসংশয় 'র'। শ্রীযুক্ত রাখাল বাবু ইহা এইরূপ পাঠ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র বাবু ইহা সন্দেহসূচক বিধায় (?) বন্ধনীর মধ্যে দিয়াছেন—সম্ভবতঃ মূল লিপিখানি না দেখিতে পারিয়াই তাঁহার সন্দেহ হইয়াছিল। মূল লিপিতে ইহা স্পষ্ট। ইহার পরের তিনটি অক্ষর শ্রীযুক্ত রাখাল বাবু ও শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র বাবু উভয়েই 'বাস্তব্য' এইরূপ পড়িয়াছেন। মূল লিপিখানি উত্তমরূপ পরীক্ষা করিয়া এই পাঠের যথার্থতা সম্বন্ধে আমার বিশেষ সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। আমি যে 'বুধায়' পাঠ করিয়াছি,

---

* ১৩২৮ বঙ্গাব্দের বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পঞ্চম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

১। বাঙ্গালার ইতিহাস, ১৯৮—১৯৯ পৃঃ।

২। Indian Antiquary, 1918, pp. 109ff

তৎসম্বন্ধেও আমি নিঃসন্দেহ হইতে পারি নাই। মোট কথা, এই কয়টি অক্ষরের প্রকৃত পাঠ এখনও নিশ্চিতরূপে উদ্ধার করিতে পারা যায় নাই।

এই লিপিখানির ঐতিহাসিক মূল্য খুব বেশী। ইহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, পালবংশের পঞ্চম রাজা নারায়ণপাল অন্ততঃ ৫৪ বৎসরকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই তথ্যটি পালরাজগণের কাল-নির্ণয়ে বিশেষ সহায়তা করে। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ ও ভিন্‌সেণ্ট্ স্মিথ্ পালরাজগণের রাজ্যাভিষেকের যে সময় নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন, এই লিপির আবিষ্কারে তাহা ভ্রান্ত প্রমাণিত হইয়াছে। রমাপ্রসাদ বাবুর মতে প্রথম বিগ্রহপাল ৯০০ খৃষ্টাব্দে ও দ্বিতীয় বিগ্রহপাল ৯৬৫ খৃষ্টাব্দের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু নারায়ণপালের অন্যূন ৫৪ বৎসর রাজ্যাঙ্কের সহিত এই মতবাদের সুসঙ্গতি হইতে পারে না। কারণ, প্রথম ও দ্বিতীয় বিগ্রহপালের মধ্যে নারায়ণপাল, রাজ্যপাল ও গোপাল, এই তিন জন নরপতি রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইঁহার মধ্যে রাজ্যপাল অন্যূন ২৪ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। গোপালের রাজত্ব-কাল জানা নাই। কিন্তু বাণগড় ও মনহলি লিপিতে রাজ্যপালের বর্ণনার পরই গোপাল-দেব সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে "শ্রীমান্ গোপালদেব-শ্চিরতরমবনে-রেকপত্ন্যা-ইবৈকো ভর্ত্তাভূৎ।" সুতরাং তিনি যে রাজ্যপাল, অপেক্ষা অধিক দিন রাজ্য-সুখ ভোগ করিয়াছিলেন, এরূপ স্থির করা যাইতে পারে। অতএব রাজ্যপাল ও গোপাল, এই উভয়ের রাজ্যকাল অন্ততঃ পঞ্চাশ বৎসর, ইহা অনায়াসেই অনুমান করা যাইতে পারে। ইহার সহিত নারায়ণপালের ৫৪ বৎসর যোগ করিলে প্রথম ও দ্বিতীয় বিগ্রহপালের ব্যবধান-কাল ন্যূনকল্পে ১০৪ বৎসর হয়।' সুতরাং রমাপ্রসাদ বাবু পালরাজগণের যে তারিখ নির্দ্দেশ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা গ্রহণ করিবার উপায় নাই। অনুরূপ যুক্তি দ্বারা ভিন্‌সেণ্ট স্মিথের মতবাদও যে অগ্রাহ্য, ইহা সহজেই প্রমাণ করা যাইতে পারে।

কিন্তু নবাবিষ্কৃত লিপিখানি যে কেবলমাত্র পুরাতন মত নিরাকরণে সহায়তা করে, তাহা নহে। ইহা দ্বারা পালরাজগণের কাল নির্ণয়রূপ বিষম সমস্যার সর্ব্বাপেক্ষা সন্তোষজনক সমাধান সম্ভবপর হইয়াছে। এই বিষয়টি কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছি, সুতরাং তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এই স্থানে কেবল সংক্ষিপ্তভাবে আমার মন্তব্যটি লিপিবদ্ধ করিতেছি।

রাজা প্রথম মহীপাল যে ১০২৫ খৃঃ অব্দের অনতিকাল পরেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন, শ্রীযুক্ত রাখাল বাবু ও শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ বাবু উভয়েই তাহা স্বীকার করিয়াছেন এবং এ বিষয়ে বিশিষ্ট প্রমাণও বিদ্যমান রহিয়াছে। রাজা মহীপালের পূর্ব্ববর্ত্তী পালরাজগণ ও তাঁহাদের জানা রাজ্যকাল-পরিমাণ এই প্রবন্ধের উপসংহারে তালিকাকারে প্রদত্ত হইল। ইহা হইতে জানা যায় যে, ধর্ম্মপাল হইতে প্রথম মহীপাল পর্য্যন্ত আট জন নরপতির মধ্যে ছয় জনের জানা রাজাকালের পরিমাণ ১৯৪ বৎসর। অবশিষ্ট দুইজনের মধ্যে দ্বিতীয় গোপাল যে রাজ্যপাল অপেক্ষা অধিক দিন রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। সুতরাং ইঁহার রাজ্যকাল ৩০ বৎসর

ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। অবশিষ্ট দ্বিতীয় বিগ্রহপালের রাজ্যকাল-পরিমাণ এবং অন্যান্য নরপতিগণ তাঁহাদের জানা রাজ্যকালের পর আর কত দিন রাজত্ব করিয়াছেন, এ সমুদয় আমাদের নিকট এখনও সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। কিন্তু মোটের উপর এই সমুদয় অনির্দ্দিষ্ট সংখ্যার সমষ্টি অন্ততঃ কুড়ি বৎসরের কম নহে, বোধ হয়, এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না। অতএব ধর্ম্মপালের সিংহাসন-লাভ ও প্রথম মহীপালের মৃত্যু, এই উভয় ঘটনার ব্যবধান ( ১৯৪+৩০+২০ ) অর্থাৎ ২৪৪ বৎসর ধরা যাইতে পারে। সুতরাং প্রথম মহীপালের মৃত্যু ১০২৫ খৃষ্টাব্দের অনতিকাল পরে ঘটিয়া থাকিলে ধর্ম্মপাল আনুমানিক ৭৮১ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়।

শ্রীযুক্ত রাখাল বাবু ও শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ বাবু উভয়েই ধর্ম্মপালের সিংহাসন-লাভ এই তারিখের ১৫ বা ৩০ বৎসর পরে ঘটিয়াছিল, এইরূপ অনুমান করিয়াছেন; কিন্তু আমার সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে একটি প্রবল যুক্তি আছে। রাষ্ট্রকূটরাজ প্রথম অমোঘবর্ষের একখানি তাম্রশাসন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্মাইকেল অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর মহাশয়ের নিকট আছে। ইহা এখনও প্রকাশিত হয় নাই, কিন্তু ভাণ্ডারকর মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে ইহা পাঠ করার অনুমতি দিয়া কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ করিয়াছেন। এই তাম্রশাসনে রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুব সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে;—

"গঙ্গাযমুনয়োর্ম্মধ্যে রাজ্ঞো গৌড়স্য নশ্যতঃ।
লক্ষ্মীলীলারবিন্দানি শ্বেতচ্ছত্রাণি যো হরেৎ॥"

ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্ত্তী ভূখণ্ডে পরাজিত কোন গৌড়পতির শ্বেতচ্ছত্র রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুবের হস্তগত হইয়াছিল। তৃতীয় গোবিন্দরাজের রাধনপুর তাম্রশাসনের[১] অষ্টম শ্লোক হইতে অনুমিত হয় যে, প্রথমে গুর্জ্জরপতি বৎসরাজ গৌড়েশ্বরকে পরাজয় করিয়া, তাঁহার শ্বেতচ্ছত্র অধিকার করেন; পরে রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুব বৎসরাজকে পরাজিত করিলে, উহা তাঁহার হস্তগত হয়। অমোঘবর্ষের অপ্রকাশিত তাম্রশাসনোক্ত 'গঙ্গাযমুনয়োর্ম্মধ্যে' ইত্যাদি বাক্য হইতে কিন্তু এ কথা নিশ্চিত জানিতে পারা যায় যে, তৎকালে গৌড়েশ্বরের রাজত্ব অন্ততঃ গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থল প্রয়াগ পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ছিল। রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুবের তারিখ জানা যায় না। কিন্তু তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী দ্বিতীয় গোবিন্দের শেষ জানা তারিখ ৭৭৯ খৃঃ অঃ এবং তাঁহার উত্তরাধিকারী তৃতীয় গোবিন্দের প্রথম জানা তারিখ ৭৯৪ খৃঃ অঃ। সুতরাং ধ্রুব ৭৮০—৭৯০ খৃঃ অব্দের মধ্যে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী বৎসরাজের একমাত্র জানা তারিখ ৭৮০ খৃঃ অঃ। অতএব ৭৯০ খৃঃ অব্দে বা তাহার অনতিকাল পূর্ব্বে গৌড় দেশের অধীশ্বর গঙ্গা-যমুনা পর্য্যন্ত বিস্তৃত রাজ্য শাসন করিতেন।

এই গৌড়পতি পাল-নরপতি ধর্ম্মপাল ভিন্ন আর কেহই নহেন, এরূপ অনুমান সহজেই করা যাইতে পারে। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী গোপালদেব মাৎস্য-ন্যায়-বিদূরিত ও বাঙ্গালা দেশে

১। Ep. Ind. VI, p. 243.

শান্তিময় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া যে অধিক দূর সাম্রাজ্য বিস্তার করিতে পারিয়াছিলেন, এরূপ মনে হয় না। আর ইহা সত্য হইলে পালবংশের প্রশস্তিকারগণ যে তাঁহার সম্বন্ধে এত বড় একটা কথার উল্লেখ পর্য্যন্ত করেন নাই, ইহা বিশ্বাস করা যায় না। গোপালদেবের রাজ্য-লাভের অব্যবহিত পূর্ব্বে বাঙ্গালা দেশে যে অরাজকতা ও মাৎস্য ন্যায়ের প্রভাব ছিল, তাহাতে কোন গৌড়পতির প্রয়াগ পর্য্যন্ত রাজ্যবিস্তার এক প্রকার অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। অপর পক্ষে ধর্ম্মপাল যে কান্যকুব্জ জয় এবং উত্তরাপথের অধিকাংশ স্বীয় সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন, তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান আছে। সুতরাং ধ্রুব অথবা বৎসরাজ কর্ত্তৃক গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্ত্তী ভূভাগে পরাজিত গৌড়পতি যে ধর্ম্মপাল হইতে অভিন্ন—এরূপ অনুমান করা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। অতএব তিনি ৭৮০—৭৯০ খৃঃ অব্দের মধ্যে রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন, ইহা এক প্রকার স্থির এবং ইহা দ্বারা আমাদের পূর্ব্বোল্লিখিত সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণরূপে সমর্থিত হয়।

আমাদের সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে একটি বড় যুক্তির কথা বলিলাম। কিন্তু ইহার বিপক্ষেও একটি যুক্তি প্রদর্শন করা যাইতে পারে। মুঙ্গেরে প্রাপ্ত দেবপালদেবের তাম্রশাসনে উক্ত হইয়াছে যে, ধর্ম্মপাল রাষ্ট্রকূটরাজ পরবলের দুহিতা রণ্ণা দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। পথারী স্তম্ভলিপিতে পরবল নামক একজন রাষ্ট্রকূট রাজা ৮৬১ খৃঃ অব্দে রাজত্ব করিতেছিলেন, এরূপ জানিতে পারা যায়। সুতরাং ইহা অনুমান করা স্বাভাবিক যে, ধর্ম্মপাল এই পরবলেরই কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। এমতাবস্থায় ধর্ম্মপালের রাজ্যারম্ভ ৭৮০ খৃঃ অব্দে ধরিলে তাঁহার ও তাঁহার শ্বশুরের মধ্যে প্রায় ৮০ বৎসরের ব্যবধান হয়। কিন্তু উক্ত পরবল বাস্তবিকই ধর্ম্মপালের শ্বশুর কি না, তাহা ধর্ম্মপালের তারিখের উপর নির্ভর করিবে। কারণ, পরবল নামে একাধিক রাজা থাকা অসম্ভব নহে। এমতাবস্থায় অন্যান্য সিদ্ধান্তের বলে ধর্ম্মপালের তারিখ নির্ণীত করিতে পারিলে কেবলমাত্র পরবলের তারিখের উপর নির্ভর করিয়া তাহা উড়াইয়া দেওয়া চলে না। বিশেষতঃ আমরা নিশ্চিতরূপে জানি যে, ধর্ম্মপাল ৮১৪ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং পরবলকে তাহার শ্বশুর বলিয়া ধরিলে, উভয়ের মধ্যে অন্ততঃ ৫০ বৎসরের ব্যবধান ঘটে। ইহা কোনক্রমেই স্বাভাবিক বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

উল্লিখিত আলোচনা অনুসারে পালরাজগণের রাজ্যকাল নিম্নলিখিত তালিকা দ্বারা নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে,—

| | রাজার নাম | জানা রাজ্যকালের পরিমাণ | রাজ্যলাভের আনুমানিক তারিখ |
|---|---|---|---|
| ১। | গোপাল | | ৭৭০ খৃঃ অঃ |
| ২। | ধর্ম্মপাল | ৩২ বৎসর | ৭৮০ „ |
| ৩। | দেবপাল | ৩৩ „ | ৮১৫ „ |
| ৪। | প্রথম বিগ্রহপাল ( শূরপাল ) | ৩ „ | ৮৫০ „ |
| ৫। | নারায়ণপাল | ৫৪ „ | ৮৬০ „ |
| ৬। | রাজ্যপাল | ২৪ „ | ৯১৫ „ |

| রাজার নাম | জানা রাজ্যকালের পরিমাণ | রাজ্যকালের আনুমানিক তারিখ |
|---|---|---|
| ৭। দ্বিতীয় গোপাল | * | ৯৪০ খৃঃ অঃ |
| ৮। দ্বিতীয় বিগ্রহপাল | * | ৯৭০ „ |
| ৯। প্রথম মহীপাল | ৪৮ বৎসর | ৯৭৮ „ |
| ১০। নয়পাল | ১৫ „ | ১০২৬ „ |
| ১১। তৃতীয় বিগ্রহপাল | ১৩ „ | ১০৪২ „ |
| ১২। দ্বিতীয় মহীপাল | * | ১০৭০ „ |
| ১৩। দ্বিতীয় শূরপাল | * | ১০৭৫ „ |
| ১৪। রামপাল | ৪২ „ | ১০৭৭ „ |
| ১৫। কুমারপাল | * | ১১২০ „ |
| ১৬। তৃতীয় গোপাল | * | ১১২৫ „ |
| ১৭। মদনপাল | ১৯ „ | ১১৩০ „ |

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার

# শ্রীহট্ট-ভাটেরার তাম্রশাসন

## ( আলোচনা )

প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে ভাটেরা বাজারের দক্ষিণ-পশ্চিমে মাইলখানিক দূরে হোমের টিলা নামক স্থলে দুইখানি তাম্রশাসন ইট খুঁড়িবার কালে আবিষ্কৃত হয়। স্থানীয় জমিদার ঐগুলি রাজপুরুষদের হস্তে সমর্পণ করিলে, বহুকাল পর্য্যন্ত কালেক্টরিতে সংরক্ষিত হইয়াছিল। তার পর, ১২৮৬ সালে সুপ্রসিদ্ধা বিদুষী রমাবাই শ্রীহট্ট শহরে আগমন করিলে, তাঁহার অগ্রজ নানাশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী এই শাসন দুইখানি পাঠ করেন; এবং সম্ভবতঃ তাঁহারই প্রয়োচনায় এগুলির ছাপ (fac simile) বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটিতে প্রেরিত হয় ও ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত হইয়া সোসাইটির পত্রিকায় সচিত্র প্রকাশিত হয়। † ডাঃ মিত্র মহোদয় বাঙ্গালার গৌরব-স্বরূপ এবং প্রত্নতত্ত্বালোচনায় তিনি সর্ব্বজনবরেণ্য ছিলেন। তথাপি এই শাসনদ্বয়ের আলোচনায় তিনি আগাগোড়া ভ্রম করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত ভ্রম এতাবৎকাল পর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপে সংশোধিত হয় নাই। ১৩০৯ সালে যখন শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত সংকলন-নিমিত্তে কৃতসঙ্কল্প হই, তখন হইতেই মূল^১ শাসন দুইখানি দেখিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়াছিলাম, কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত সেইগুলি দেখিবার সৌভাগ্য ঘটিয়া উঠে নাই।

পরন্তু, মূল^২ শাসন দেখিবার সুযোগ না ঘটিলেও, ডাঃ রাজেন্দ্রলালের পাঠ ও আলোচনা আমার এবং অনেকেরই নেত্রগোচর হইয়াছে, এবং যিনিই অবধানসহকারে তদীয় পাঠ ও ব্যাখ্যা পড়িবেন, তিনিই তাঁহার ভ্রান্তি অনায়াসে ধরিতে পারিবেন। আমার নিকটে যে সকল বিষয় ভ্রান্ত বলিয়া বোধ হইয়াছে, তাহা ইতঃপূর্ব্বে নানা প্রবন্ধে ‡ অবান্তরভাবে বলিয়াছি—এখানেও সংক্ষেপতঃ সেগুলিকে এই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করিব। কিন্তু প্রথমতঃ শাসনদ্বয়ের মর্ম্মপ্রকাশ আবশ্যক মনে করি।

---

* ২৪শে মাঘ, ১৩২৭, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের শ্রীহট্টশাখার প্রথম অধিবেশনে পঠিত।

† Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, No VIII—August, 1880 দ্রষ্টব্য।

‡ 'প্রদীপ'—কার্ত্তিক, ১৩১১—"ফকির শাহ জলাল" (প্রথম প্রবন্ধ মদীয় "প্রবন্ধাষ্টকে" পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে)।

১। Mr. Gait's History of Assam—a critical study—(শেষাংশ)। Hindustan Review—February, 1908—(ইহাও পুস্তিকাকারে পুনঃপ্রকাশিত হইয়াছিল)।

২। শ্রীযুক্ত বিরজাকান্ত ঘোষ-লিখিত "সুক্ষ ও শিলিহট্টলো" প্রবন্ধের "পরিশিষ্ট"—শ্রীভূমি—অগ্রহায়ণ, ১৩২২। [কারণবিশেষে তখন নামটা প্রকাশ করা হয় নাই।]

৩। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত-সঙ্কলয়িতা শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি মহাশয়ের নিকট লিখিত পত্র: (শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত, ২য় ভাগ, ২য় অধ্যায়ে কিয়দংশ উদ্ধৃত)।

## প্রথম শাসন

শাসনখানি দুই পৃষ্ঠায় লিখিত। প্রথম পৃষ্ঠে ২৭ ও দ্বিতীয় পৃষ্ঠে ২৮ পঙ্‌ক্তি। এই শাসনে প্রথমতঃ ২০টি নানাছন্দোগ্রথিত শ্লোক আছে। প্রথম শ্লোকে মহাদেবের নমস্কার; ২য় শ্লোকে 'হরশিরঃকিরীটরত্ন' চন্দ্রের বর্ণনা; ৩য় শ্লোকে চন্দ্রের বংশে বিখ্যাত নৃপতিগণের উৎপত্তির কথা; ৪র্থ শ্লোকে "শ্‌হ (ট্ট) রাজ্যকমলার" প্রভব নরগীর্ব্বাণ খরবাণ রাজার উল্লেখ; ৫ম শ্লোকে তাঁহার পুত্র গোকুলদেব, ও ৬ষ্ঠে তৎপুত্র নারায়ণদেব উল্লিখিত হইয়াছেন। সপ্তম শ্লোক হইতে ষোড়শ পর্য্যন্ত শাসনপ্রদাতা গোবিন্দকেশব বর্ণিত হইয়াছেন। ১৭শ শ্লোকে হট্টপাটকে অবস্থিত ভগবান্ বটেশ্বর মহাদেবের উল্লেখ আছে এবং ১৮শ হইতে বিংশ শ্লোকে এই শ্রীহট্টনাথ শিবের উদ্দেশ্যে ৩৭৫ হল পরিমিত ভূমি, ২৯৬ খানি বাড়ী এবং নানাজাতীয় লোকজন সেবার্থ প্রদত্ত হইল—এ কথা লিখিত হইয়াছে। ইহাতে দ্বিতীয় পৃষ্ঠার দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত অধিকৃত হইয়াছে। অতঃপর ভূয়িষ্ঠভাবে দেশ-প্রচলিত ভাষায় ভূমি ও বাড়ী (পরিমাণ ও সংখ্যা সহ) কোন্ কোন্ স্থানে বা গ্রামে দেওয়া হইয়াছে, তাহা লেখা হইয়াছে; এবং পরিশেষে (বোধ হয়) উৎসর্গীকৃত লোকজনেরও নাম (২য় পৃষ্ঠায় ২৫শ। ২৬শ পঙ্‌ক্তিতে) প্রদত্ত হইয়াছে। অতঃপর দুইটি মামুলি শ্লোক আছে,—একটিতে দানের ফল, অপরটিতে দত্ত ভূমির অপহরণকারীর প্রতি অভিশাপবাক্য আছে। এগুলি অধিকাংশ শাসনেই প্রায় অবিকল দেখা যায়। সর্ব্বশেষে "পাণ্ডবকুলাদি পালাব্দ" বলিয়া অস্পষ্ট অঙ্ক আছে।

## দ্বিতীয় শাসন

ইহা প্রথম শাসন অপেক্ষা অনেক ছোট; দুইটি পৃষ্ঠা ইহাতেও আছে। প্রথম পৃষ্ঠে ১৬ এবং দ্বিতীয় পৃষ্ঠে ১৫ পঙ্‌ক্তি মাত্র; আবার পঙ্‌ক্তির দৈর্ঘ্য প্রথম শাসনের পঙ্‌ক্তির দুই-তৃতীয়াংশ হইবে। ইহার লিপিভাগ সমস্তই ছন্দোনিবদ্ধ, কিন্তু উপজাতি এবং অনুষ্টুভ্ বৃত্ত ভিন্ন অন্য ছন্দ ইহাতে নাই। সমুদয়ে শ্লোকসংখ্যা ২২টি; তন্মধ্যে একুশটি পুরা (চতুষ্পদী) শ্লোক; একটি অর্দ্ধ শ্লোক। প্রথমতঃ নারায়ণের বন্দনা; দ্বিতীয় শ্লোকে (পূর্ব্বশাসনের ন্যায়) চন্দ্রের উল্লেখ; তৃতীয়ে তদ্বংশজ গোকুলদেব, ৪র্থ ও ৫মে তৎপুত্র নারায়ণদেব, ৬ষ্ঠ হইতে ১১শ শ্লোকে (প্রথম শাসনপ্রদাতা) গোবিন্দকেশবদেব বর্ণিত হইয়াছেন। অতঃপর শ্লোকত্রয়ে কেশব-পুত্র (এই দ্বিতীয় শাসনপ্রদাতা) ঈশানদেবের বর্ণনা আছে। ১৫শ শ্লোকে তৎকর্তৃক নির্ম্মিত বিষ্ণুমন্দিরের উল্লেখ আছে। সম্ভবতঃ শাসনপ্রদত্ত ভূমি তদুদ্দেশ্যেই উৎসৃষ্ট *। ১৬শ শ্লোকে 'রাজপট্টনিক' বৈদ্যবংশীয় বনমালী করের নাম আছে। ইঁহারই কথায় শাসন প্রদান করা হইয়াছিল—১৭শ শ্লোকের প্রথমার্দ্ধে আছে। ঐ শ্লোকের দ্বিতীয়ার্দ্ধে স্থবির অপুত্রক রাজপুত্রের উল্লেখ আছে। ১৮শ শ্লোকটি অর্দ্ধ শ্লোক, † ইহাতে বাস্তশস্য-সমন্বিত প্রদত্ত ভূমির পরিমাণ ২ হল ছিল, বলা

* আশ্চর্য্যের বিষয় যে, শাসনে সম্প্রদানের স্পষ্ট উল্লেখ দেখা যায় না।

† ইহা ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ বলিয়া মনে হয়।

হইয়াছে। তৎপরবর্ত্তী অর্থাৎ ১৯শ শ্লোকে মৃত রাজপুত্রের স্ত্রী ও শিশুপুত্রের উল্লেখ আছে। তৎপরবর্ত্তী ২০শ শ্লোকে সেনাপতি বীরদত্ত 'আদেশিক' ছিলেন, ইহা উক্ত হইয়াছে। অতঃপর উপান্ত্য শ্লোকে সেই মামুলি কথা—দত্ত ভূমিহরণকারীর সম্বন্ধে অভিশাপবাক্য রহিয়াছে। অন্তিম শ্লোকে দাসকুলাবতংস মাধব এই প্রশস্তির রচয়িতা—ইহা বলা হইয়াছে। সর্ব্বশেষে "সং ১৭" ১লা বৈশাখ তারিখ আছে।

অবশ্য এখানে শাসনদ্বয়ের উক্তরূপ সংক্ষিপ্তসার না দিয়া সমগ্র শাসন দুইখানি বঙ্গানুবাদ সহ লিখিয়া দিতে পারিলে খুবই ভাল হইত; কিন্তু তাহা করিতে হইলে মূল শাসনখানি দেখা আবশ্যক। সোসাইটির পত্রিকায় একটা ছাপের ছবি মাত্র আছে। ইহার উপর নির্ভর করিয়া পাঠ-বিচার, ডাঃ রাজেন্দ্রলালের পাঠ সহ তুলনা ইত্যাদি নিরাপদ্ নহে; তাই এ কার্য্যের ভার ভবিষ্যৎ আলোচনাকারীর উপরেই ন্যস্ত রাখা হইল। * যাঁহারা ডাঃ মিত্রের পাঠ দেখিতে চান, তাঁহারা সোসাইটির পত্রিকা এবং শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি-সংকলিত শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত—দ্বিতীয় ভাগ, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায় পাঠ করিতে পারেন। তবে ছাপের ছবি দেখিয়াই ডাঃ মিত্রের পাঠ † সম্বন্ধে দুই একটি গুরুতর বিষয় এ স্থলে আলোচনা করা যাইবে।

প্রথম শাসনের ৪র্থ শ্লোকটি ( ছাপের ছবি দেখিয়াও ) এই পড়া যায়,—

"অথ বিশ্রুতপ্রভাবঃ প্রভবঃ শৃহরাজ্যকমলায়াঃ।
সমজনি নরগীর্ব্বাণঃ খরবাণঃ ক্ষ্মাভুজাং শ্রেষ্ঠঃ॥"

এই শ্লোকটি ডাঃ মিত্র পড়িয়াছেন,—

"অথ বিশ্রুতপ্রভাবঃ প্রভবঃ স্বচ্ছরাজ্যকমলায়াঃ।
সমজনি নবগীর্ব্বাণঃ খরবাণঃ ক্ষ্মাভুজাং শ্রেষ্ঠঃ॥"

অর্থাৎ 'শৃহ' স্থলে 'স্বচ্ছ' এবং 'নরগীর্ব্বাণ' স্থলে 'নবগীর্ব্বাণ' পড়িয়াছেন। এই শাসনে ব ও র প্রায় এক রকমই দেখা যায়; মধ্যে মধ্যে 'পেটকাটা' গোছের 'র'ও আছে; এবং নরগীর্ব্বাণে 'র'টির যেন স্পষ্টই পেট কাটা আছে। বিশেষতঃ 'নবগীর্ব্বাণ' অপেক্ষা 'নরগীর্ব্বাণ' (=নরদেব=রাজা) পাঠে সুষ্ঠুতর অর্থ হইত। এ অবস্থায় ডাঃ রাজেন্দ্রলালের ভুল করাটা ঠিক হয় নাই। তথাপি এটা বরং মার্জ্জনীয়। কিন্তু 'শৃহ'কে "স্বচ্ছ" কোনও রূপেই করা যায় না, তালব্য 'শ'টি স্পষ্টই আছে,

* জানিয়া সুখী হইলাম, শ্রীহট্ট মুরারীচাঁদ কলেজের ইতিহাস-অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন গুপ্ত মহাশয় এ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। তিনি মূল শাসনখানি, তথা শাসনবিষয়ীভূত ভূভাগ যেন এক বার স্বচক্ষে দেখেন, এই অনুরোধ। *স্থানীয় তদন্তে অবহেলা করাতেই ডাঃ রাজেন্দ্রলাল এত অধিক ভুল করিয়া ফেলিয়াছেন।*

† ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র শাসন দুইখানিতে ভুল-ভ্রান্তিস্থলে "যাহা হওয়া উচিত" মনে করিয়াছেন, তাহাই লিখিয়াছেন,—শাসনে "কি আছে", তাহা দেখান নাই; অর্থাৎ "মূলে এই আছে, কিন্তু শুদ্ধ পাঠ এই হইবে" এরূপ-ভাবে পাঠ বিচার করেন নাই। ইহাতে তিনি শাসনস্থ সন্দিগ্ধ স্থলে কোন্ অক্ষরটিকে প্রকৃতপক্ষে কি পড়িয়াছিলেন, তাহা বলা যায় না। হয় ত অক্ষরগুলি ঠিকই পড়িয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার নিকটে কোন কোনটি সার্থক হয় না বলিয়া, তিনি ঐ সকল পরিবর্ত্তিত করিয়া তত্তৎস্থলে অভিনব অক্ষর বসাইয়া দিয়াছেন॥

তন্নিম্নে দীর্ঘ ঋকারও স্পষ্ট এবং 'হ'ও ঠিকই আছে; তবু কেন যে তিনি ইহাকে 'স্বচ্ছ' করিলেন, এটা কোনক্রমেই বোঝা যায় না। অনুবাদ করিতে গিয়াও যদি এই পরিবর্ত্তনে কোনও সুবিধা হইত, তাহা হইলে কথা ছিল না। সেখানে তিনি 'স্বচ্ছ' শব্দটি একেবারেই চাপিয়া গিয়াছেন। *

ফলকথা, আমাদের দুরদৃষ্টবশতঃ শাসনলেখক 'শ্রী' স্থলে 'শৃ' লিখিয়াছেন, এবং 'ট্ট'টি একেবারেই ছাড়িয়া দিয়াছেন। ডাঃ রাজেন্দ্রলাল যদি ছন্দোবিচার করিতেন, তবেই পতিত অক্ষরের উদ্ধার হইত। আর্য্যার দ্বিতীয় পাদে ১৮টি মাত্রা হইবে; 'ট্ট' লোপ হওয়ায় মাত্রাসংখ্যা ১৬ হইয়াছে; 'ট্ট' বসাইলে ঠিক আঠারই হয়। অপিচ, এই শাসনেরই বিংশ শ্লোকে ঠিক তেমনই 'শৃ' দিয়া শ্রীহট্ট ( মাথায় ) লেখা হইয়াছে—সেখানে ডাঃ রাজেন্দ্রলাল অনায়াসে শুদ্ধ পাঠ ধরিতে পারিয়াছেন। †

ডাঃ মিত্রের এই ভুলটি হওয়াতে তাম্রশাসন-প্রদাতা রাজগণ কোন্ রাজ্যের অধিপতি ছিলেন, তাহা অনিশ্চিত ছিল। এক ভ্রম অপর ভ্রান্তির জনক। তাই 'স্বচ্ছ' পাঠের কোনও অর্থ হয় না; অথচ অক্ষরের সঙ্গে কোনও সদৃশ্য নাই, দেখিয়া পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন বিদ্যার্ণব মহাশয় এই রাজ্যটিকে 'সুহ্ম' মনে করিয়াছিলেন। ‡ যদিও তিনিই 'নবগীর্ব্বাণ' যে 'নরগীর্ব্বাণ' হইবে, একথা স্বয়ং তাম্রশাসন দেখিয়া নির্ণয় করিয়াছিলেন।

নবগীর্ব্বাণের ন্যায় 'ব' ও 'র'-য়ে গোলযোগসূচক পাঠ আরো আছে। যথা, 'মহরাপুর' স্থলে 'মহবাপুর' (২য় পৃষ্ঠা, ৩য় পঙ্‌ক্তি) আজিও "মৌরাপুর" বলিয়া একটি স্থান বর্ত্তমান রহিয়াছে।

এ ছাড়া 'স্বচ্ছ' রাজ্যের ন্যায় ভুলও আরো আছে। যথা,—'নবপঞ্চণে' ( ২ পৃষ্ঠা, ৩য় ও ৪র্থ পঙ্‌ক্তি); ইহার ঠিক পাঠ হইবে "বর পঞ্চালে"; এখনও 'বরমচাল § পরগণা ( এবং রেলওয়ে ষ্টেশন ) বিরাজমান।

---

* অনুবাদ এই,—"Now was born the noblest of kings Navagirvan (the new God) of fierce arrow (*kharavana*) of great renown, the issue of the Goddess of royal prosperity." অনুবাদের টীকায় তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহাও উল্লেখযোগ্য—"The words (*Nava girvana*) and *Kharavana* are so placed that either of them may pass for a proper name, or both may be epithets. I take at random the first for the proper name. The second may be an *alias*." 'খরবাণ' নামটি এমনই অভিনব যে, ইহা বিশেষণ হইলেই যেন ভাল হইত, কিন্তু এটা যে নাম, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই, ( নরদেব স্থলে ) 'নরগীর্ব্বাণ' বিশেষণ দ্বারা 'অনুপ্রাস' করিয়া নামটিকে মোলায়েম করা হইয়াছে।

† শ্রীহট্টকে 'শৃহট্ট' লেখাটা বড়ই কৌতুককর; মাত্রা ও উচ্চারণ ঠিকই আছে, তথাপি বাণান ভুল হইল, অথচ এটা রাজ্যের নাম। আবার ভুলটি একাধিক বার হইয়াছে। সংজ্ঞা বলিয়াই বোধ হয়, এরূপ বাণান-বিভ্রাট ঘটিয়াছে। এখনও পণ্ডিত মহাশয়েরা নাম লিখিতে যথেচ্ছ বর্ণবিন্যাস করিয়া থাকেন। এই শাসনে প্রকৃত রাজবাড়ীর জায়গায় নামেও ঐরূপ ভুল বাণানের বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে।

‡ "শ্রীভূমি"—বৈশাখ, ১৩২২; 'শ্রীভূমির পূর্ব্বকথা' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। শ্রীযুক্ত বিরজাকান্ত ঘোষ "সুহ্ম" ও শিলিচটনোর ( "শ্রীভূমি"—অগ্রহায়ণ, ১৩২২ ) প্রবন্ধে ইহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন।

§ এখন অনেকে ইহার নাম "ব্রহ্মচাল" লেখেন—ইহা যেন ভুল, এই শাসনই তাহার প্রমাণ।

এ বিষয়ে আর অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। শাসনদ্বয়ের সমালোচনা করিতে গিয়া ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয় প্রধান ভ্রম করিয়াছেন—রাজা গোবিন্দকেশবকে গৌড়গোবিন্দ মনে করিয়া। গৌড়গোবিন্দ শ্রীহট্টের শেষ রাজা; তাঁহার পরেই শ্রীহট্ট-দেশ মোসলমানের শাসনাধীন হয়। গৌড়গোবিন্দের তিনি প্রকৃত বিবরণ জানেন নাই—জানিতে চেষ্টাও করেন নাই, বোধ হয়। কেবল স্থানীয় একটা প্রবাদ শুনিয়াছিলেন যে, শাসনপ্রাপ্তির স্থানে গৌড়-গোবিন্দের বাড়ী ছিল। ঐ জনরবের মূলে সত্য কত দূর ছিল, জানা যায় না। তবে শ্রীহট্টাধিপতি গৌড়গোবিন্দের নানাস্থানেই কাচারী-বাড়ী থাকা অসম্ভাবিত নহে। সাধারণলোকের প্রাচীন অপর কোনও রাজাকেও 'গৌড়গোবিন্দ' মনে করাও আশ্চর্য্য নহে। বয়োবৃদ্ধ লোকের মুখে এমনও শুনিয়াছি যে, 'গোবিন্দ' শব্দটি রাজবাচক ছিল। শ্রীহট্টের ঐ অঞ্চলের নাম যে 'গৌড়' ছিল, তাহা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ কথা; তাহা হইলে, শ্রীহট্টের এই অংশের রাজামাত্রেই "গৌড়ের গোবিন্দ" বা 'গৌড়গোবিন্দ' সংজ্ঞিত হওয়া বিচিত্র নহে।

সে যাহা হউক, গৌড়গোবিন্দের কোনও উত্তরাধিকারীর সংবাদ পাওয়া যায় না—অথচ গোবিন্দকেশবের পুত্র ঈশানদেব দ্বিতীয় শাসনখানির কর্ত্তা। তাহাতে মোসলমান আক্রমণের নামগন্ধও নাই। এই রাজার নামও যে কেবল "গোবিন্দ"ই, এমনও নহে। প্রথম শাসনে দুই বার ও দ্বিতীয় শাসনে এক বার তাঁহার নাম আছে। * তন্মধ্যে প্রথম শাসনে একবার ও দ্বিতীয় শাসনে "গোবিন্দ" যেন কেশবের বিশেষণ বা নামান্তর বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু প্রথম শাসনে দ্বিতীয় বার উল্লেখে শুধু "কেশবদেব"ই থাকায়, স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, প্রধান নামটি ইহাই ছিল। 'দেব' শব্দটি সর্ব্বত্রই কেশবের সঙ্গে আছে—'গোবিন্দ' শব্দ 'দেব' এই রাজ-সূচক পদযুক্ত হয় নাই। এই সকল কারণেও কেশবদেবকে গৌড়গোবিন্দ ভাবা অতীব অসমীচীন হইয়াছে। ইহাতে আবার গুরুতর ভ্রমের কারণ ঘটিয়াছে। গৌড়গোবিন্দ শাহ্ জলাল কর্তৃক পরাভূত হন—ডাঃ মিত্র ইহাও শুনিয়াছিলেন। বাঙ্গালার ইতিহাসে জলাল উদ্দীন গাজি নামধেয় এক দিগ্বিজয়ীর উল্লেখ আছে; তিনি গৌড়গোবিন্দ-বিজেতা শাহ্ জলাল এবং এই জলাল উদ্দীনকে অভিন্ন মনে করিয়া এক হাস্যাস্পদ ভুল করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, শাহ্ জলাল এক জন পীর ছিলেন—শ্রীহট্ট শহরেই তাঁহার সাধনার স্থান ছিল—এখানেই মরণান্তে সমাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। জলাল উদ্দীন—ডাঃ রাজেন্দ্রলালেরই কথায় বলি,—"Was called back to defend Gaur from the invasion of Irsilam Khan, and soon after killed in battle." কোথায় পীর শাহ্ জলাল, আর কোথায় জেনারেল জলাল উদ্দীন!! অপিচ, জলাল উদ্দীনের পূর্ব্বদেশ বিজয়ের তারিখ ছিল—১২৫৭খৃষ্টাব্দ। এই জলাল উদ্দীনই শাহ্ জলাল, এবং শাহ্ জলাল-বিজিত 'গৌড়গোবিন্দই' শাসনোল্লিখিত গোবিন্দকেশব। এই ভ্রমপরম্পরায় পরিচালিত হইয়া

* —ত্রিপুরাজশেত্রী গোবিন্দ ইত্যবমি কেশবদেব এবঃ (১ম শাসন, ৭ম শ্লোক)।
শ্রীমৎ কেশবদেব এব নিয়তং চক্রেহবশেষং কৃথা (ঐ—৯ম শ্লোক)।
গোবিন্দবীরো জয়নাথসংজ্ঞঃ * * * পুত্রোহভবৎ কেশবদেবদেবঃ।—(দ্বিতীয় শাসন, ৬ষ্ঠ শ্লোক)

ডাঃ মিত্র শাসনের তারিখ যথাসম্ভব ঐ ১২৫৭ অব্দের কাছাকাছি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি তাই পাণ্ডবকুলাদি পালাব্দের অঙ্ক ৪৩২৮ করিয়া প্রথম শাসনের সময়টা ১২৪৫ খৃষ্টাব্দ করিয়াছেন। পণ্ডিতা রমাবাইর অগ্রজ শ্রীনিবাস শাস্ত্রী মহাশয় ঐ অঙ্কটা ২৯২৮ পড়িয়াছিলেন, তাহাতে শাসনের তারিখ, খৃষ্টাব্দ (বরাহের মতে) * ৪৮০ হয়। শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি মহাশয় দ্বিতীয় শাসনে 'সং ১৭ কে'। "সংবৎ ১৭" ধরিয়া প্রথম শাসনের তারিখ ২৩২৮ (ডাঃ মিত্রের দ্বিতীয় অঙ্ক ও শ্রীনিবাস শাস্ত্রীর ১ম অঙ্ক রাখিয়া) করিয়াছেন, তাহাতে খৃষ্টপূর্ব্ব ১২০ হয়। এই তিন মতেই ভ্রান্তি আছে বলিয়া আমার ধারণা।

ছাপের ছবিতে অব্দাঙ্ক বড়ই অস্পষ্ট, মূল শাসনখানি না দেখিলে কিছুই বলা যাইতে পারে না। ডাঃ রাজেন্দ্রলাল যে কারণে ৪৩২৮ করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। কারণেই যখন ভুল, তখন কার্য্য ভ্রান্ত হইবেই। লিপির আকৃতি দেখিয়া আনুমানিক সময় নির্দ্দেশই তাঁহার কাছ হইতে প্রত্যাশিত ছিল—তিনি সে পথে যান নাই, শ্রীনিবাস শাস্ত্রীর মতে যে সময় দাঁড়ায়, অক্ষর তত প্রাচীন নহে। অচ্যুত বাবু দ্বিতীয় শাসনে 'সং ১৭ কে' সংবৎ অর্থাৎ বিক্রমাব্দ ধরিয়া ভুল করিয়াছেন; ইহা স্পষ্টই শাসনদাতার (ঈশানদেবের) রাজ্যাব্দ। খৃষ্টপূর্ব্বের শাসনের অক্ষর অতিশয় দুর্ব্বোধ্য।

লিপি দেখিয়া শাসনের সময় একটা মোটামুটি অনুমান করা যায় বটে, কিন্তু তাহাতে শতাব্দী অগ্র-পশ্চাৎ হইবার সম্ভাবনা; বিশেষতঃ যেমন বর্ত্তমানে, তেমনি সে কালেও সকল স্থানের সমসাময়িক লিপিও একরূপ ছিল না, তাই লিপিভঙ্গী দেখিয়া অনুমান করা নিরাপদ্ নহে। বিশেষতঃ মাদৃশ অনত্যভিজ্ঞের পক্ষে। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু এই লিপি দশম শতাব্দীর বলিয়া অনুমান করেন। আপাততঃ আমরা ইহাই শিরোধার্য্য করিতে বাধ্য হইতেছি।

এই রাজপরিবার চন্দ্রবংশীয় বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। ডাঃ রাজেন্দ্রলাল ইঁহাদিগকে 'কাছাড়ী' বলিয়াছেন—কেন না, কাছাড়ী রাজগণ আপনাদিগকে (ঘটোৎকচের সন্তান বলিয়া) চন্দ্রবংশীয় খ্যাপিত করিয়াছিলেন। কিন্তু নিকটস্থ ত্রিপুরার রাজগণের কথা বিস্মৃত হইয়া, তিনি কেন দূরস্থ কাছাড়ে গেলেন, বুঝিলাম না। † ত্রৈপুর নৃপতিরাও (যযাতির পুত্র দ্রুহ্যুর সন্তান বলিয়া) চন্দ্রবংশীয়ত্বের দাবিদার বটেন; এবং আমার বোধ হয়, এই রাজগণও ত্রিপুরাধিপতির শাখাবিশেষ হইবেন।

---

* বরাহমিহিরের মতে শালিবাহনের অব্দে (শকাব্দে) ২৫২৬ যোগ করিলেই যুধিষ্ঠিরের কাল পাওয়া যায়। —[ শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত, ২য় ভাগ ১ম খণ্ড—২য় অধ্যায়, ২৫ পৃষ্ঠায় অচ্যুত বাবুর বিচার দ্রষ্টব্য ]

† এতদুপলক্ষে ডাঃ মিত্র এটুকুও বলিয়াছেন—"It is extremely doubtful, however, if the Pandavas even came so far to the East". আমাদের এ অঞ্চলকে অনেকেই "পাণ্ডববর্জ্জিত" মনে করেন—কিন্তু এ বিষয়ে ভিন্ন মতও আছে—বিশেষতঃ জয়ন্তীয়া (নারীদেশ), মণিপুর (বভ্রুবাহনের রাজ্য) নাগপর্ব্বত (উলূপীর পিত্রালয়) ইত্যাদিতে আগমন হইয়া থাকিলে, এ অঞ্চলে পাণ্ডবের পদার্পণ ঘটিয়াছিল কি না, সুধীভির্বিভাব্যম্।

এই শ্রীহট্ট রাজ্যটি যে নেহাৎ ক্ষুদ্র ছিল, তাহা বোধ হয় না। সৈন্যসামন্তাদির বর্ণনায় অত্যুক্তি সর্ব্বত্রই থাকে; তদুপরি নির্ভর করিয়া কিছু বলিতে পারি না। কিন্তু একটি শিব-মন্দিরের সেবা ও পূজার জন্য ৩৭৫ হাল জমি, ২৯৬ খানি বাড়ী এবং অনেক লোকজন যিনি একটা শাসনপত্রে দান করিতে পারিয়াছেন, তিনি যে-সে নরপতি ছিলেন না। ৩৭৫ হালে প্রায় দুই বর্গ মাইল ভূমি হয়।

এই 'হল' পরিমাণটা কি ছিল, ডাঃ রাজেন্দ্রলাল বুঝিতে পারেন নাই এবং শাসনের আলোচনাংশের ভূরিভাগই তিনি 'হল'শব্দের উপরি মন্তব্য প্রকাশে ব্যয়িত করিয়াছেন, অথচ শ্রীহট্ট জেলায় এখনও হাল-কেদার-যষ্টি-রেখ দ্বারা জমির মাপ হইয়া থাকে। * [ ৭ হাতি নলের † এক বর্গ নলে রেখ, ৪ রেখে ১ যষ্টি, ২৮ যষ্টিতে ১ কেদার এবং ১২ কেদারে ১ হাল ( ৬৫৮৫৬ বর্গ হস্ত = ৩·৪ একর )। এ স্থলে একটা আশ্চর্য্যের কথা বলিতে হইল। সমীপবর্ত্তী বঙ্গদেশে 'হল' পরিমাণের ব্যবহার পাওয়া যায় নাই, কিন্তু সুদূরবর্ত্তী গুর্জ্জর প্রদেশের এক শাসনে তাহা পাওয়া গিয়াছে। গুজরাটের শুনক নামক স্থানে চালুক্যরাজ কর্ণদেব বিক্রম সংবৎ ১১৪৮ অব্দে ( ১০৯১ খৃষ্টাব্দে ) "পাইলাং ১২ বহন্তী হল ৪ ইতি হলচতুষ্টয়ভূমী" ‡ শাসন দ্বারা প্রদান করেন। কেশবদেবের শাসনে ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল 'হল' শব্দের উপর যেরূপ গবেষণা প্রয়োগ করিয়াছেন, কর্ণদেবের শাসনের আলোচয়িতা ডাঃ হুল্‌শ্‌ তাহা করেন নাই; তবে "পাইলাং বহন্তী" স্থলে অনুবাদে carrying (i.e. requiring as seed corn) 12 Pailum (or 48 sers) লিখিয়া নীচে ফুটনোটে বলিয়াছেন,—"I owe this explanation of the words পাইলাং ১২ বহন্তী to Dr. Buhler, who remarks on them—"The translation is merely tentative. Pailām seems to be the Guzarati plural of Pailum, which latter I take to be identical with the modern Pāyālī 'a measure of 4 sers' (or 4-8 pounds)" See Shapurje Edalje's Gujarati and English Dictionary, 2nd Edition—S. V. পায়লী।

এখানে আরো একটু আশ্চর্য্যের বিষয় আছে। আমাদের নিজ গ্রামে ( বাণিয়াচঙ্গে ) "পাইলা" শব্দটিও চলিত এবং ইহার মাপ এইরূপ,—

| | |
|---|---|
| ৭৷৷৹ সের ( ধান ) | ১ পূরা |
| ৪ পূরায় | ১ পালী |
| ৪ পালীতে | ১ ভূতা |
| ১৬ ভূতায় | ১ পাইলা। |

* এইগুলি সমস্তই সংস্কৃত শব্দ এবং এটা শ্রীহট্টের বড়ই গৌরবের কথা যে, বঙ্গীয় সমাজের অন্যত্র বিঘা কাঠা ইত্যাদি সংস্কৃতেতর শব্দ দ্বারা জমির পরিমাণ হয়—কেবল শ্রীহট্টেই হলাদি প্রাচীন শব্দগুলি অদ্যাপি অব্যাহত রহিয়াছে।

† স্থলভেদে নলের পরিমাণ ঈষৎ ভিন্ন হয়, তাহা নগণ্য।

‡ এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা—১ম বর্ষ—৩১৬ পৃষ্ঠা হইতে ৩১৮ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত দ্রষ্টব্য।

খুব উৎকৃষ্ট জমিতে ভালরূপ চাষ হইলে আমাদের দেশে ১ কেদারে ৪ ভূতা পর্য্যন্ত ধান হইতে পারে; তাহা হইলে ৪ হালে ( ৪ × ১২ = ) ৪৮ কেদারে ৪৮ × ৪ ÷ ১৬ = ১২ পাইলা ধান হইতে পারে। গুর্জ্জর দেশের জমিও সম্ভবতঃ ঈদৃশ উর্ব্বরাই ছিল, এই নিমিত্ত "১২ পাইলাং বহন্তী হল ৪" ঐ শাসনে দেখিতে পাইতেছি। ডাঃ বুলার 'বহন্তী' শব্দের যে অর্থ করিয়াছেন, তাহা বোধ হয়, 'পাইলাং'এর পরিমাণ না বুঝিয়া। নচেৎ ইহার স্বাভাবিক অর্থ ১২ পাইলা উৎপন্নশীলা * ৪ হল জমিই হইবে। তিনি 'পায়লী' শব্দ দ্বারাও বিভ্রান্ত হইয়াছেন। আমাদের দেশেও স্বতন্ত্র একটি "পালী" শব্দ আছে, তবে ইহার পরিমাণ ৪ সের নহে ( ৪ × ৭॥ = ) ত্রিশ সের।

কোথায় শ্রীহট্ট, আর কোথায় গুজরাট্—এই দুই বিপরীতের সম্মেলন—meeting of the two extremes—আশ্চর্য্যের বিষয় নয় কি?

উপসংহারের পূর্ব্বে আর একটি বিষয়ের কিঞ্চিৎ আলোচনা † প্রয়োজনীয় মনে করিতেছি। প্রথম শাসনের ২য় পৃষ্ঠায় ১১শ পঙ্‌ক্তিতে "সাগরপশ্চিমে" একটি শব্দ রহিয়াছে; ডাঃ রাজেন্দ্রলাল অনুবাদে "West of Sagare ( Sea ? )" লিখিয়াছেন। Sea বা সমুদ্র শ্রীহট্টে কোথা হইতে আসিল, এ সন্দেহ নিশ্চয়ই তাঁহার মনে উদিত হইয়া থাকিবে, এবং এই সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়াই অনেক প্রত্নতত্ত্বিক যুয়নচোয়াং-কথিত "শিহলিচটলো" সমতটের উত্তরপূর্ব্বে স্পষ্ট লিখিত হইয়া থাকিলেও "শ্রীহট্ট" যে শিহলিচটলো, ইহা ধারণা করিতে পারিতেছেন না। কেন না, যুয়ন-চোয়াং শিহলিচটলোকে "সাগরের তীরে" লিখিয়া গিয়াছেন। আমাদের দেশ-প্রচলিত 'হাওর' শব্দটি সাগরেরই অপভ্রংশ মনে করি; এবং 'সাগরপশ্চিমে' যে জমিটুকু—তাহা সুপ্রসিদ্ধ হাকালুকি হাওরের পশ্চিম দিকে অবস্থিত ছিল, বোধ হয়। দ্বিতীয় শাসনেও দুই বার ( ১ম পৃষ্ঠা, ১৩শ পংক্তিতে ও ২য় পৃষ্ঠা, ৩য় পংক্তিতে ) নৌবাটক শব্দ আছে, ইহার অনুবাদে ডাঃ রাজেন্দ্র-লাল 'War bqute' লিখিয়াছেন। এইগুলির অস্তিত্বেও শ্রীহট্টরাজ্যে সাগরসদৃশ জলরাশির তাৎকালিক বিদ্যমানতা সূচিত করিতেছে। মাত্র ১৪৩ বৎসর পূর্ব্বে যখন মিঃ লিণ্ডসে শ্রীহট্টে গবর্ণর হইয়া ঢাকা হইতে আইসেন, তখন তাঁহাকে বিশাল জলরাশিমধ্যে সাগরোপযোগী দিগ্দর্শন-যন্ত্রের ব্যবহার করিয়া নৌ-পরিচালন করিতে হইয়াছিল। ‡

ডাক্তার রাজেন্দ্রলালের ভুল-ভ্রান্তির সমালোচনার্থ মুখ্যতঃ এই প্রবন্ধের অবতারণা। তাই বলিয়া তাঁহার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করিলে অন্যায় হইবে। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে এই

---

* কামরূপের কোনও কোনও শাসনে এত পরিমাণ ( যথা, চতুঃসহস্র ) "ধান্যোৎপত্তিমতী" ভূমির কথা আছে—তাই এ স্থলে 'বহন্তী'রও ইহাই অর্থ—ইংরাজিতে "bearing" হওয়াই উচিত।

† ইহার অনেক কথা বিস্তারিতভাবে "সমতটের পূর্ব্বে" নামক প্রবন্ধে ( সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ১৩২৬—১ম সংখ্যা দ্রষ্টব্য ) করা হইয়াছে।

‡ "I shall not be disbelieved when I say that in pointing my foot towards Sylhet I had recourse to my compass—the same as at sea, and steered a straight course through a lake not less than one hundred miles in extent.—(Extract from two Lives of Lindsay's—'Statistical Account of Assam'—Vol. II, p. 263).

শাসন দুইখানি তিনিই পাঠ ও অনুবাদ করিয়া প্রকাশিত করিয়াছিলেন—তাই আমরা আমাদের দেশের একটি লুপ্ত রাজ্যের সংবাদ পাইয়াছিলাম। মানবমাত্রেই ভ্রমপ্রমাদের অধীন—অতএব ভুল-ভ্রান্তি সকলেরই ঘটিতে পারে। এই প্রবন্ধলেখকের সমালোচনাতেও তাহা থাকিবার সম্ভাবনা। ক্ষমাপরায়ণ সুধীবর্গ, আশা করি, সমস্তই সদয়ভাবে গ্রহণ করিবেন।

শ্রীপদ্মনাথ দেবশর্ম্মা

—o—

# বুদ্ধঘোষের টীকা

## ( ভূমিকা )

জনশ্রুতি চলিয়া আসিতেছে যে, থের বুদ্ধঘোষ কতকগুলি ধর্ম্মশাস্ত্রের টীকা রচনা করেন। সেই টীকাগুলির প্রধান পুস্তকের নাম বিসুদ্ধিমগ্গ, এখানি বিশ্বকোষ-জাতীয় গ্রন্থ। বুদ্ধঘোষ সম্বন্ধে প্রবাদ এই যে, তিনি সমগ্র বিনয়পিটক, পাতিমোক্খ, চারিটি নিকায় এবং অভিধম্ম-পিটকের সপ্ত পরিচ্ছেদের টীকা প্রণয়ন করেন। খুদ্দক-নিকায়ের কতক অংশের টীকাও তাঁহার রচনা বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। শ্রীমতী রীজ্ ডেভিড্স্-পত্নী বুদ্ধঘোষ সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—বুদ্ধঘোষের রচনা অপুষ্ট, অপরিণত হইলেও তাহা বিশেষ অর্থদ্যোতক এবং ঐতিহাসিক তথ্যের খনি; ইহা পাঠ না করিলে বৌদ্ধ দর্শনের সম্পূর্ণ ধারণা হওয়া অসম্ভব[১]।

আমরা এই প্রবন্ধে বুদ্ধঘোষের রচনার মধ্যে তাঁহার মনস্বিতার পরিণতির ধারা অনুসরণ করিবার চেষ্টা করিব।

### ১। বুদ্ধঘোষের টীকার উদ্ভব ও পরিণতি

বিশেষ কোনো প্রসিদ্ধ পুস্তক বা ধর্ম্মশাস্ত্রকে নিজের বিদ্যা, বুদ্ধি ও ধারণা দ্বারা নূতন অর্থে ব্যাখ্যা করার নাম টীকা। টীকা রচনার প্রধান উদ্দেশ্য—গ্রন্থকারের উক্তি ও উদ্দেশ্য যথাযথভাবে অপরের বোধগম্য করা।

গুরু রেবত শিষ্য বুদ্ধঘোষকে বলিয়াছিলেন,—

"কেবলমাত্র পালি বা ত্রিপিটক এখানে আনা হইয়াছে, তাহার কোনো টীকা এখানে নাই। থেরবাদী ভিন্ন অপর কোনো গুরুর বিভিন্ন মতবাদও এখানে নাই। সিংহলী ভাষায় মনস্বী মহিন্দ কর্ত্তৃক লিখিত টীকা তথাগত বুদ্ধদেবের শিক্ষা-প্রণালী অনুযায়ী রচিত হইয়াছিল, তিন বৌদ্ধধর্ম্মসঙ্গীতিতে উপস্থাপিত হইয়াছিল, সারিপুত্ত ও অন্যান্য মনস্বীর দ্বারা পরীক্ষিত হইয়াছিল। সেই টীকা এখনো সিংহলে প্রচলিত আছে। তুমি তথায় যাও ও উহা পাঠ করিয়া, উহা মাগধী ভাষায় অনুবাদ কর। ইহাতে জগতের কল্যাণ হইবে[২]।"

ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, বুদ্ধঘোষের সময়ে ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মশাস্ত্রের কোনো টীকা প্রচলিত ছিল না, অথচ সিংহলে ছিল। ইহাও অনুমান করা যাইতে পারে যে, আমরা এখন যে সব টীকা দেখিতে পাইতেছি, তাহা বুদ্ধঘোষ বা তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী প্রসিদ্ধ ধর্ম্ম-ব্যাখ্যাতা মহিন্দ কর্ত্তৃক রচিত নহে। প্রবাদ ও জনশ্রুতি হইতে এই বুঝা যায় যে, এই সব টীকা কোনো

---

* ১৩২৮ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের নবম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

১। Introductory Essay, Buddhist Psychological Ethics, p. XXV.

২। মহাবংশ, ৭ম পরিচ্ছেদ; Anderson's Pali Reader, p. 28; বিসুদ্ধিমগ্গ (বুদ্ধদত্ত সংস্করণ), ২ পৃষ্ঠা। তুলনীয়—সাসনবংশ, ৩১ পৃষ্ঠা।

লেখকের রচনা নয়, এক সঙ্ঘান্তর্গত সতীর্থ-সম্প্রদায়ের রচনা। মহিন্দ সেই রচনাগুলি সিংহলী ভাষায় ও বুদ্ধঘোষ তাঁহা হইতে পালি ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন মাত্র।

বুদ্ধঘোষ বিবিধ টীকার[৩] ভূমিকায় স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন যে, পূর্ব্ববর্ত্তী কেহ যে সকল পদের টীকা করেন নাই, কেবল সেই সকল পদের টীকাই তিনি করিয়াছেন এবং অন্যান্য পদের পূর্ব্বপ্রচলিত টীকার অনুবাদ মাত্র করিয়াছেন।

এ পর্য্যন্ত যত প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, বুদ্ধদেবের বোধিলাভের দশ বৎসরের মধ্যেই তৎকালের বহু প্রসিদ্ধ নগরে—যেমন বারাণসী, রাজগহ ( রাজগৃহ ), বেসালি ( বৈশালী ), নালন্দা, পাবা, উজ্জনী ( উজ্জয়িনী ), চম্পা, মধুরা ( মথুরা ), উলুম্পা, ইত্যাদিতে—বৌদ্ধ ধর্ম্মসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এইরূপ প্রত্যেক কেন্দ্রে বুদ্ধদেবের এক এক জন প্রসিদ্ধ শিষ্যের ( যেমন, মহাকাস্‌সপ (মহাকাশ্যপ ), মহাকচ্চায়ন (মহাকাত্যায়ন ), মহাকোট্‌ঠিত, সারিপুত্ত ( সারিপুত্র ), মোগ্‌গল্লান ( মৌদ্গল্যায়ন ) প্রভৃতির অধিনায়কতায় এক একটি ভিক্ষু-সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছিল। ভিক্ষু বা শ্রমণ-সম্প্রদায়ের নিয়ম অনুসারে তাহারা সারা বৎসর প্রব্রজ্যা করিত এবং বর্ষাকাল সমাগত হইলে কোনো মঠে বা রাজার প্রমোদ-উদ্যানে আশ্রয় লইয়া বর্ষা যাপন করিত, এবং বর্ষা অপগত হইলে বৎসরান্তে সকল ভিক্ষু রাজগহ (রাজগৃহ), বেলুবন সাবত্থি (শ্রাবস্তি ) বা অন্য কোথাও সমবেত হইত। স্বসম্প্রদায়ের ভিক্ষুদের মধ্যে পরস্পর সাক্ষাৎ ও ভিন্ন সম্প্রদায়ের যতী প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎ মধ্যে মধ্যে হইত। এই সব ভিক্ষু-সম্প্রদায়ের অধিনায়কগণ এক এক জন এক একটি বিশেষ গুণের জন্য বিখ্যাত ছিলেন,—কেহ শাস্ত্রজ্ঞ, কেহ যতী, কেহ কৃচ্ছ্রব্রতী, কেহ গল্প বলিতে পটু, কেহ ব্যাখ্যা করিতে দক্ষ, কেহ প্রচারকার্য্যে সমর্থ, কেহ দার্শনিক, কেহ কবি, ইত্যাদি[৪]। বুদ্ধদেবের শিষ্য ও অনুচরদের মধ্যে অনেকে ব্রাহ্মণও ছিলেন, এবং তাঁহারা বেদ ও বেদাঙ্গ প্রভৃতি বৈদিক শাস্ত্রের পারদর্শী ছিলেন। বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্য হইতে জানিতে পারা যায় যে, এই সব শিক্ষাগুরু নানা স্থানে পর্য্যটন করিয়া—ধর্ম্ম, দর্শনশাস্ত্র, শীলশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র ও ব্যবহারশাস্ত্র সম্বন্ধে বিচার ও আলোচনা করিতেন[৫]। প্রসিদ্ধ ও শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মশিক্ষকদের তত্ত্বমূলক দুর্ব্বোধ্য উক্তির, বিচার ও বিতর্ক প্রায়ই হইত এবং ব্যাখ্যা ও টীকা-প্রণয়নের মূল কারণই ঐরূপ বিচার-বিতর্ক। ত্রিপিটকের মধ্যে বহু স্থানে লিখিত আছে যে, সময়ে সময়ে সাময়িক ঘটনা লইয়া ভিক্ষুদের মধ্যে বিষম বিতর্ক উপস্থিত হইত, এবং বিতর্কে সন্দেহ মীমাংসা না হইলে, উভয় বিবদমান পক্ষ হয় বুদ্ধদেব অথবা তাঁহার শিষ্যদের মধ্যস্থ মানিত। যদি কখনো কোনো স্বার্থবশ ভিক্ষু বুদ্ধদেব, বুদ্ধদেব-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মসম্প্রদায় সম্বন্ধে নিন্দা

---

৩। সুমঙ্গলবিলাসিনী, ১ পৃষ্ঠা (Pali Text Society); সারত্থপকাসিনী, ( সারার্থপ্রকাশিনী )—১ পৃষ্ঠা।

৪। দ্রষ্টব্য—এতদগ্গবগ্গো, অঙ্গুত্তরনিকায়, ১; মহাবংশ (edited by Geiger), The Council of Mahakassapa.

৫। দ্রষ্টব্য—আমার লেখা A Short Account of the Wandering Teachers at the time of the Buddha—(J. A. S. B. New Series, Vol. XIV, 1918, No. 7).

প্রচার করিত[৬]; যদি কোনো ভিক্ষু বুদ্ধদেবের মতবাদের কদর্থ করিত[৭]; যদি দুই ভিক্ষুসঙ্ঘের মধ্যে কোনো বিষয় লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইত[৮]; যদি কোনো ভিক্ষু শীলভঙ্গ করিত, তবে সকল ভিক্ষু চত্বরে সমবেত হইয়া বিচার ও মীমাংসা করিত, অথবা বুদ্ধদেব বা তাঁহার শিষ্যগণ ভিক্ষুদিগকে বিবাদ মীমাংসার জন্য আহ্বান করিতেন। এইরূপ এক সময়ে বুদ্ধদেব স্বীয় মতবাদ অনুসারে নীতিতত্ত্ব ও শীল ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন—সব্ব পাপস্স অকরণম্ কুসলস্স উপসম্পদা!—সর্ব্ববিধ পাপ অকরণীয়, মঙ্গল কর্ম্ম অনুষ্ঠিতব্য। বুদ্ধদেবের এই অকরণীয় ও করণীয় সম্বন্ধে এক কথার উপদেশ এখন দীর্ঘনিকায়ের প্রথম ত্রয়োদশ সুত্তে (সূত্রে) লিপিবদ্ধ আছে এবং সেই সুত্তগুলি শীলখণ্ড নামে পরিচিত হইয়া দীঘনিকায়ের প্রথম অংশকে সেই নাম দান করিয়াছে[৯]।

অন্য এক সময়ে পোতলিপুত্ত পরিব্রাজক সমিদ্ধির (সমৃদ্ধি) নিকটে গিয়া বলিয়াছিলেন,—শমণ (শ্রমণ) গোতমের উক্তি আমি স্বকর্ণে শুনিয়াছি—"কম্ম (কর্ম্ম) কায়িক বা বাচিক হইলে কর্ম্মই নহে, যথার্থ কর্ম্ম হইতেছে মানস কম্ম বা ইচ্ছা। জীবনে এমন অবস্থা-সম্প্রাপ্তি ঘটে, যখন সুখ বা দুঃখের অতীত বোধ জন্মে।" ইহার উত্তরে সমিদ্ধি বলিলেন,—"বন্ধু পোতলিপুত্ত, এমন করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে বলিও না; আমাদের গুরুর মতের কদর্থ করিও না, তাহা সাধু কর্ম্ম নহে; তিনি এমন কথা কখনো বলিতে পারেন না।" পোতলিপুত্ত বলিলেন,—"বন্ধু সমিদ্ধি, মানুষ চিন্তায়, বাক্যে বা কায় দ্বারা যে কর্ম্ম ইচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া করে, তাহার ফলে সে কি ভোগ করে?" সমিদ্ধি উত্তর করিলেন,—"দুঃখ"[১০]। এই তর্কের বিবরণ যখন বুদ্ধদেবের নিকট পৌঁছিল, তখন তিনি তাঁহার অপরিচিত পরিব্রাজকের দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে নির্ব্বুদ্ধি সমিদ্ধির একদেশী উত্তর শুনিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন; তাঁহার মতে প্রকৃত উত্তর হওয়া উচিত ছিল—"সে হয় সুখ নয় দুঃখ ভোগ করিবে, অথবা সুখ বা দুঃখ কিছুই বোধ করিবে না।" কিন্তু সমিদ্ধির প্রথম উত্তর সম্বন্ধে বুদ্ধদেব প্রতিবাদ করিবার কিছুই পান নাই।

যাহাই হৌক, যুবক শিক্ষার্থী সমিদ্ধির উত্তর ভুল হইয়াছিল বলিয়া বুদ্ধদেব কর্ম্ম সম্বন্ধে বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে শুভ নামক ব্রাহ্মণকে কর্ম্ম সম্বন্ধে যে সংক্ষিপ্ত উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহার নাম হইয়াছিল চুল্লকম্মবিভঙ্গ, এই বিস্তৃত উপদেশের নাম হইল মহাকম্মবিভঙ্গ[১১]। এইরূপে এই মহাকম্মবিভঙ্গ অভিধম্মপিটকের অন্তর্গত সিখ্খাপদবিভঙ্গ (শিক্ষাপদবিভঙ্গ) নামক অভিধর্ম্ম ব্যাখ্যার সূত্র-ভিত্তি হইয়াছিল[১২]। বুদ্ধদেব-কথিত এই দুই উপদেশ ও ব্যাখ্যার প্রভাব পরবর্তী শাস্ত্র-টীকার উপর স্পষ্ট দেখা যায়, যেমন—নেত্তিপকরণ (নাস্তিপ্রকরণ) ও অত্থসালিনী (অর্থশালিনী)[১৩] প্রভৃতি টীকা। বিশেষ

৬। দীঘনিকায়, ১ ভাগ, ২ পৃষ্ঠা। ৭। মজ্‌ঝিমনিকায়, ৩ ভাগ, ২০৭—৮ পৃঃ। ৮। মজ্‌ঝিমনিকায়, সামগামসুত্ত, ২ ভাগ, ২৪৩—৪ পৃষ্ঠা। ৯। The Dialogues of the Buddha, II, pp. 3—26.

১০। মজ্‌ঝিমনিকায়, ৩, পৃষ্ঠা ২০৭-২১৫। ১১। ঐ, ২০২—২০৬ পৃষ্ঠা; নেত্তিপ্রকরণ, ১৮২—১৮৩ পৃষ্ঠা।

১২। বিভঙ্গ, ২৮৫—২৯১ পৃষ্ঠা। ১৩। অত্থসালিনী, ৬৪—৬৮ পৃষ্ঠা।

লক্ষ্য করিয়া পাঠ করিলেই বুঝা যায় যে, বুদ্ধঘোষ তাঁহার অত্থসালিনী টীকায় কর্ম্মের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা বুদ্ধদেবের দুইবারের কর্ম্ম ব্যাখ্যার সমন্বয় মাত্র[14]।

মজ্ঝিমনিকায়ের ( মধ্যমনিকায় ) মধ্যে বুদ্ধদেবের আরো অনেক জ্ঞানসমুজ্জ্বল উপদেশ সংগৃহীত আছে, তাহাদের মধ্যে প্রধান সড়ায়তনবিভঙ্গ[15], অরণবিভঙ্গ[16], ধাতুবিভঙ্গ[17] এবং দক্‌খিনা-বিভঙ্গ[18]। এই সমস্তই অভিধম্ম সাহিত্যে[19] স্থান লাভ করিয়াছে এবং উচ্চতর ব্যাখ্যা ও টীকা তাহাদের সঙ্গে সংযুক্ত হইয়াছে। থের বুদ্ধঘোষের চিরস্মরণীয় রচনা ও পরবর্ত্তী অন্যান্য রচনার মধ্যেও ঐগুলি প্রবেশলাভ বা প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

বুদ্ধদেবের প্রধান শিষ্য থের সারিপুত্ত চতুরার্য্যসত্যের যে সব ব্যাখ্যা টীকা করিয়াছিলেন, সেইগুলি সংগ্রহের নাম সচ্চবিভঙ্গ ( সত্যবিভঙ্গ )[20] বা সচ্চনিদ্দেস ( সত্যনির্দ্দেশ )[21]। এইগুলি অভিধম্মপিটকের দ্বিতীয় খণ্ডে বা ভাগে স্থান পাইয়াছে, এবং এই টীকার আবার টীকা হইয়াছে, অভিধম্ম-ভাজনীয়[22]। পিটক-সাহিত্য যে সব প্রাচীন অসংলগ্ন উক্তির সংগ্রহ, সারিপুত্ত সেই সব উক্তির ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই টীকা সতিপট্‌ঠান-সুত্ত নামক টীকার সহিত সংযুক্ত হইয়া দীঘনিকায়ের মহাসতিপট্‌ঠানসুত্ত হইতে মজ্‌ঝিমনিকায়ের সতিপট্‌-ঠানসুত্তের পার্থক্য সম্পাদন করিয়াছে।

ধর্ম্মব্যাখ্যা-সংক্রান্ত বহু আবশ্যক বাক্য ও পদের টীকা প্রশ্নোত্তররূপে বিদ্যমান দেখা যায়। জনশ্রুতি যে, এগুলির রচয়িতা সারিপুত্ত। এই প্রশ্নোত্তর আকারের টীকাগুলির নাম মহাসঙ্গীতিসুত্তান্ত[23] ( মহাসঙ্গীতিসূত্রান্ত ); তিব্বতী ও চীন ভাষায় ইহার অনুবাদ আছে, তাহার নাম সঙ্গীতি-পরযায়-সূত্র। থের সারিপুত্তের প্রশ্নোত্তরপ্রণালীর ব্যাখ্যায় অবলম্বিত বিভিন্ন বিষয় সংখ্যানির্দ্দিষ্ট বিভাগে সজ্জিত করার প্রথা দুইটি প্রাচীনতর সংগ্রহপুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায়—সংযুত্ত ( সংযুক্ত ) ও অঙ্গুত্তরনিকায়, অভিধম্মপিটকের কোনো কোনো ভাগ বিশেষ করিয়া পুগ্‌গল-পঞ্‌ঞত্তি ( পুগ্‌গলপ্রজ্ঞপ্তি ) ইহার উপকরণ প্রধানতঃ অঙ্গুত্তর-নিকায় হইতে সংগৃহীত, এই সকল পুস্তক আলোচনা করিলে সারিপুত্ত-রচিত পুস্তকাবলীর সঙ্গে পিটক-সাহিত্যের সম্পর্ক বুঝিতে পারা যায়।

কিন্তু সারিপুত্ত একমাত্র টীকা রচয়িতা নহেন। বুদ্ধদেবের অপর বহু বিখ্যাত ও সুপণ্ডিত শিষ্যদিগের রচিত টীকা ও ব্যাখ্যা পুস্তক আছে, এবং তাঁহাদের মধ্যে অনেকে আবার নারী। থের মহাকচ্চায়ন ( স্থবির মহাকাত্যায়ন ) বুদ্ধদেবের সংক্ষেপ উক্তির বিশদ ব্যাখ্যা করিতে

---

১৪। মজ্‌ঝিমনিকায়, ২১৫—২২২ পৃষ্ঠা। ১৫। ঐ, ২৩০—২৩৭ পৃষ্ঠা। ১৬। ঐ, ২৩৭—২৪৭ পৃষ্ঠা।

১৭। ঐ, ৭০—৭৩ পৃষ্ঠা। ১৮। বিভঙ্গ, ৭০—৭৩, ৮২—৯০ পৃষ্ঠা। তুলনীয়—ধাতুকথা, ইত্যাদি।

১৯। মজ্‌ঝিমনিকায়, ৩, ২৮৪—২৫২ পৃষ্ঠা। ২০। মহাসতিপট্‌ঠান সুত্তন্ত দীঘনিকায়।

২১। বিভঙ্গ, ৯৯—১১২ পৃষ্ঠা। ২২। বিভঙ্গ, ১৯৩—২০৫ পৃষ্ঠা।

২৩। দীঘনিকায় ৩। বিশেষ বিবরণের জন্য ১৯০৫ সালের Journal of Pali Text Societyর ৬৭ পৃষ্ঠায় অধ্যাপক তাকাকুসু-লিখিত জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

পটু বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন[২৪]; তাঁহার রচনার চারিটি খণ্ড হইল—মজ্‌ঝিমনিকায়[২৫]; ইহা পরবর্ত্তী কালের রচনা, দুইখানি পালি—নেত্তিপকরণ ও পেটকোপদেস—এবং একখানি বৌদ্ধসংস্কৃতে লিখিত—জ্ঞানপ্রস্থানশাস্ত্র—পুস্তকের মূল। এই পুস্তক তিনখানিও তাঁহারই রচনা বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। মহাকচ্চানো (মহাকচ্চায়নো) রচিত যে কয়েকখানি খণ্ডিত পুস্তক আমাদের কাল পর্য্যন্ত টিকিয়া আছে, সে কয়খানিতে মানবমনের বহুমুখীনতার পরিচয় পাওয়া যায় বলিয়া, তাহাদের মূল্য অনেক বেশী। এই সব খণ্ড রচনা হইতে যতদূর জানা যায়, তাহাতে এই বোঝা যায় যে, মহাকচ্চানো (মহাকাত্যায়ন) সারিপুত্তের মতন সংখ্যা-নির্দ্দেশ বা পারিভাষিক শব্দ সংগঠন করিতেন না। তিনি বুদ্ধদেবের মতবাদের ও তত্ত্বের অন্তর্নিহিত গূঢ় অর্থ ও যথার্থ দার্শনিক ব্যাখ্যা প্রকাশ করিতেই চেষ্টা করিয়াছেন।

তার পর থের মহাকোট্‌ঠিত। ইনি বুদ্ধদেবের তত্ত্ব-বিশ্লেষণপ্রণালী পটিসম্ভিদা সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের পরেই অভিজ্ঞ বলিয়া প্রসিদ্ধ। অভিজ্ঞতার বিভিন্ন উপকরণের দ্যোতক সংজ্ঞাগুলির বিশেষ লক্ষণ ও প্রভেদ[২৬] নির্দ্দেশ করিয়া তিনি ভ্রান্ত ধারণা সম্বন্ধেও সাবধান করিয়া বলিয়াছেন যে, যুক্তি, বোধ, অনুভূতি, ভাব প্রভৃতি এক একটি স্বতন্ত্র বিষয় নহে, তাহাদের সকলগুলি প্রকৃতপক্ষে অচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত[২৭]। মহাকোট্‌ঠিত-টীকার প্রথম অংশ নেত্তিপকরণের লক্খনহার, (লক্ষণহার) মিলিন্দ-পঞ্‌হো (মিলিন্দ-প্রশ্ন)[২৮] ও বুদ্ধঘোষের টীকার কোনো কোনো অংশের ভিত্তি-স্বরূপ।

মগ্‌গল্লান, আনন্দ, ধম্মদিন্না, খেমা প্রভৃতিরও এইরূপ রচনা বিদ্যমান আছে।

অভিধম্মপিটকের দ্বিতীয় ভাগের বিষয়সূচী আলোচনা করিলে নিঃসন্দেহ প্রতীতি হয় যে, সুত্ত ও অভিধম্মপিটকের মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য নাই, কেবল রচনাপ্রণালীর বিভেদ আছে মাত্র। সুত্ত প্রাচীনতর; অভিধম্ম তাহারই অনুসরন করিয়াছে। অভিধম্মের ব্যাখ্যানপ্রণালী শৃঙ্খলাবদ্ধ সুস্পষ্ট ও সরল হইলেও সকল ক্ষেত্রেই ইহা সুত্ত ব্যাখ্যানপ্রণালীর চেয়ে উৎকৃষ্ট নয়। বৌদ্ধশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে যে, অভিধম্ম রচনার মধ্যে গোতম বুদ্ধের কথিত বাণী যথাযথ স্থান পাইয়াছে কি না[২৯]। তবে এ কথা নিশ্চয় যে, অভিধম্মের অধিকাংশই

২৪। পহোতি চ আয়স্মা মহাকচ্চানো ইমস্স ভগবতা সংকিত্তেন উদ্দেসস্স উদ্দিট্‌ঠস্স বিত্থারেন অত্থং অবিভত্তস্স বিত্থারেন অত্থ: বিভজিতুং বিভজনম্ হি কচ্চানো।—দীপবংশ, ওলডেনবার্গ কর্ত্তৃক সম্পাদিত, ১০৯পৃষ্ঠা। তুলনীয়—এতদগ্‌গবগ্‌গ, অঙ্গুত্তরনিকায়।

২৫। মজ্‌ঝিমনিকায়, ১।১১০ পৃষ্ঠা ও পরবর্ত্তী পৃষ্ঠা; ৩। ৭৮, ১৯৪, ২২৩ পৃষ্ঠা।

২৬। পজানাতি পজানাতীতি……তস্মা পঞ্‌ঞবা তি বুচ্চতি……বিজানাতি বিজানাতীতি……তস্মা বিঞ্‌ঞানন্তি বুচ্চতি……… —মজ্‌ঝিমনিকায় ১।২৯২।

২৭। ইমে ধম্মা সংসট্‌ঠা নো বিসংসট্‌ঠা……।—মজ্‌ঝিমনিকায়।

২৮। মিলিন্দ-পঞ্‌হো, ৬২ পৃষ্ঠা।

২৯। অট্‌ঠসালিনী, ২৯—৩১ পৃষ্ঠায় থেরদিগের মধ্যে এ সম্বন্ধে তর্ক দ্রষ্টব্য।

বুদ্ধদেবের উপদেশ ও তত্ত্বকথা অবলম্বন করিয়াই সংরচিত। অদৃশ্যভাবে সারিপুত্ত বা অপর কাহারো হাত থাকিলেও, মোটের উপর ইহার জন্য সমস্ত প্রশংসাই যে স্বয়ং বুদ্ধদেবের প্রাপ্য, তাহা ইতিহাস প্রমাণ করিয়াছে। বুদ্ধঘোষ অভিধম্মপিটকের পৃথক সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন—বেয়াকরণ বা ব্যাখ্যান। এই শ্রেণীর অন্তর্গত সমস্ত গাথা-শূন্য গদ্য সুত্ত; এগুলি বৌদ্ধ সাহিত্যের অষ্ট বিভাগের কুত্রাপি পাওয়া যায় না[৩০]।

উপরোক্ত বিবরণ হইতে জানা যায় যে, বেদল্লগুলিকে স্বতন্ত্র শ্রেণী বলিয়া গণ্য করা ঠিক নয়। মজ্ঝিমনিকায়ের অন্তর্গত চুল্লবেদল্ল ও মহাবেদল্ল বেয়াকরণ শ্রেণীতে গণ্য না হইবার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যাহাই হোক, ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, খ্রীষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতকে রচিত কথাবত্থু (কথাবস্তু) ছাড়া অপর সকল ত্রিপিটকের ভিতর দুইটি বেয়াকরণ স্তর আছে, যথা—সুত্তভাজনীয় ও অভিধম্মভাজনীয়। খন্ধ, বিভঙ্গ, নিদ্দেস—এগুলি সমার্থক শব্দ। যে সমস্ত সুত্তের মধ্যে খন্ধ, বিভঙ্গ, নিদ্দেস প্রভৃতি শব্দ আছে, তাহা প্রথম স্তরের এবং সুত্তমূল ছয়টি অভিধম্ম বৌদ্ধ টীকা-সাহিত্যের দ্বিতীয় স্তর। তৃতীয় স্তর স্থির করা তত সহজ নয়। মহাকচ্চানো কর্ত্তৃক রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ কতকগুলি গ্রন্থ—কচ্চায়নপকরণম্, (কাত্যায়নপ্রকরণ) মোহনেনিত্তিপকরণম্, নেত্তিপকরণম্, চুত্তনেনিত্তি, পেটকোপদেস, ও বন্ননিতি অথবা থের মোগ্‌গলিপুত্ত তিস্স কর্ত্তৃক রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ কথাবত্থু এই তৃতীয় স্তরের অন্তর্গত বলিয়া ধরিতে হইবে। রাজা অশোকের সময়ে যে তৃতীয় বৌদ্ধধর্ম্ম-সঙ্গীতি হয়, খুব সম্ভব তৎসমকালে কথাবত্থু রচিত হয়। মহাকচ্চানোর পুস্তকাবলী এখনো অধিকাংশই পুথির আকারেই আছে, ছাপা হয় নাই। পেটকোপদেস বিশেষ মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, উহা নেত্তিপকরণ গ্রন্থের পরিশিষ্ট ছাড়া আর কিছু নয়। অধ্যাপক ই হার্ডী রোমান অক্ষরে নেত্তিপকরণের একটি সুন্দর সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন।

অধ্যাপক তাকাকুসু বলেন যে, মহাকাত্যায়ন কর্ত্তৃক বৌদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় রচিত জ্ঞানপ্রস্থান-শাস্ত্র সর্ব্বাস্তিবাদীদিগের বিশেষ প্রামাণ্য গ্রন্থ। বসুবন্ধু তাঁহার অভিধর্ম্মকোষে[৩২] সপ্ত অভিধম্ম পুস্তকের অন্তর্গত বলিয়া ঐ জ্ঞানপ্রস্থান শাস্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। ৩৮৩ খৃষ্টাব্দে ঐ শাস্ত্র সঙ্ঘদেব ও অন্য একজন কর্ত্তৃক চীন ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। ইহা আবার ৬৫৭ খৃষ্টাব্দে হিউয়েন সাং অনুবাদ করেন। হিউয়েন সাং আরও অনুবাদ করিয়াছিলেন, অভিধর্ম্মমহাবিভাসশাস্ত্র। এই গ্রন্থ মহাকাত্যায়নের গ্রন্থের টীকা, কনিষ্কের সময়ে যে বৌদ্ধধর্ম্ম-সঙ্গীতি হইয়াছিল, উহা সেই সময়ের রচনা[৩৩]। চীন পরিব্রাজক হিউয়েন সাং বলিয়াছেন

৩০। সুমঙ্গলবিলাসিনী ১।৩২৪ পৃষ্ঠা ; অথসালিনী, ২৫—২৬ পৃষ্ঠা।

৩১। Hardy, Introduction to the Nettipakarana, p. 33, F. I.

৩২। E. Burnouf's Introduction, p. 447.

৩৩। Beal's Buddhist Records, I, pp. 174—175. cf. Bunyunanjio's Catalogue, Sub. No. 263.

যে, জ্ঞানপ্রস্থানশাস্ত্র বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্ব্বাণের ৩০০ বৎসর পরে রচিত। জ্ঞানপ্রস্থানশাস্ত্রের সঙ্গে নেত্তিপকরণের অথবা অভিধম্মপিটকের সপ্তম পরিচ্ছেদ পট্‌ঠানের কোনো সাদৃশ্য বা সমতা আছে কি না, তাহা বৌদ্ধশাস্ত্রজ্ঞগণের অনুসন্ধেয়। নেত্তিপকরণের মধ্যে একটি পরিচ্ছেদের নাম সাসনপট্‌ঠান (শাসনপ্রস্থান); তাহাতে ভাবানুযায়ী পিটকপদাবলী বিভক্ত ও বিন্যস্ত হইয়াছে। পালি অভিধম্ম গ্রন্থ পট্‌ঠানের সহিত জ্ঞানপ্রস্থানশাস্ত্রের সম্পর্ক থাকিলেও উভয় পুস্তক একই নয়। যেটুকু সাদৃশ্য ও সমতা উভয়ের মধ্যে পাওয়া যায়, তাহা একই বিষয় ও উদ্দেশ্য লইয়া রচনার ফল।

মহাকচ্চায়ন তাঁহার দুই গ্রন্থের প্রারম্ভে সরলভাবে স্বীকার করিয়াছেন যে, তাঁহার গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য নূতন কোনো তত্ত্ব প্রচারের জন্য নয়, পরন্তু অপরের বাক্যের (পরতোঘোষা) ধারাবাহিক বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করাই তাঁহার উদ্দেশ্য[৩৪]। নেত্তিপকরণের এক পরিচ্ছেদ পরীক্ষার হার[৩৫] পট্‌ঠান সম্বন্ধে আলোচনা হইলেও কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ বিষয়ে নূতন আলোকপাত করিয়াছে। নয়সমুট্‌ঠান সম্বন্ধে অনুচ্ছেদ হইতে জানা যায় যে, মহাকচ্চায়ন বৌদ্ধ প্রচলিত ধর্ম্মবিরোধীদের কথা উল্লেখ করিয়া (দিট্‌ঠিচরিতা অস্মিং শাসনে পব্বজিতা) সেই সম্প্রদায়-বহির্ভূত অপর লোকদের (দিট্‌ঠিচরিতা ইতো বহিদ্ধা পব্বজিতা) সঙ্গে পার্থক্য প্রদর্শন করিয়াছেন। বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্ব্বাণের এক শত বৎসরের মধ্যে এরূপ করা সম্ভব নয়। উহাতে ত্রিপিটকের ও চতুর্নিকায়ের কোনো কোনো পদ উদ্ধৃত হইয়াছে, দেখা যায়। অতএব মহাকচ্চায়নের পুস্তকাবলী ত্রিপিটক ও পরবর্ত্তী সমস্ত বৌদ্ধশাস্ত্রের মধ্যবর্ত্তী সংযোগ শৃঙ্খল বলিয়া অনুমান করিলে সত্য হইতে বিচ্যুত হওয়া হইবে না বোধ হয়। এবং এই অনুমান সত্য হইলে মহাকচ্চায়নের রচনাবলী কথাবত্থু অপেক্ষা প্রাচীনতর—ইহাও স্বীকার করিতে হইবে।

কথাবত্থু বৌদ্ধশাস্ত্রের চতুর্থ স্তরের পুস্তক। উহাতে বৌদ্ধ ধর্ম্মতত্ত্ব ও বৌদ্ধ দার্শনিক তত্ত্ব সম্বন্ধে তর্ক-মীমাংসা আছে। বুদ্ধঘোষ যে হেতুবাদে এই পুস্তককে পালি শাস্ত্রের সঙ্গে সংযুক্ত করিতে চাহেন, তাহাতে বিশেষ চাতুর্য্য আছে[৩৬]। বুদ্ধদেব মূল তত্ত্ব (মাতিকা) বিবৃত করিয়াছিলেন; পরবর্ত্তী কালে বিভিন্ন ধরণের চিন্তাশীল ও মতবাদীরা সেই মূলতত্ত্বগুলি আলোচনা করিয়া নিজের নিজের জ্ঞান, বুদ্ধি, মত ও ধারা অনুযায়ী তাহাদের অর্থব্যাখ্যা করিয়াছিলেন[৩৭]। কথাবত্থু তর্কবহুল পুস্তক বলিয়া উহাকে টীকাগ্রন্থের মধ্যে প্রধান স্থান দিতে ইতস্ততঃ হইতে পারে; কিন্তু বিশেষ লক্ষ্য করিলে ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, ইহা ব্যাখ্যাপুস্তক ছাড়া আর কিছুই নয়। মহাকচ্চায়ন যথার্থই বলিয়াছেন[৩৮] যে, প্রচলিত ধর্ম্মমতবিরোধী বৌদ্ধগণের পরস্পরের মধ্যে ব্যক্তিগত মতদ্বৈধ থাকিলেও প্রত্যেকের মধ্যে এই মিলটুকু দেখা যায় যে, তাঁহারা প্রত্যেকেই তাঁহাদের ধর্ম্মগুরু বুদ্ধদেবের বাণী ও উপদেশের প্রতি

---

৩৪। B. M. Barua's Prolegomena to A History of Buddhist Philosophy, pp. 10,42.

৩৫। নেত্তিপকরণ, ৭৮—৮০ পৃষ্ঠা।

৩৬। নেত্তিপকরণ, ১১০—১১২ পৃষ্ঠা। ৩৭। অট্ঠসালিনী, ৪—৬ পৃষ্ঠা। ৩৮। নেত্তিপকরণ, ১১২ পৃষ্ঠা।

ভক্তিমান্। কথাবত্থুর মধ্যে যে সব তর্কবিতণ্ডার পরিচয় ও নমুনা পাওয়া যায়, তাহা হইতে দেখা যায় যে, বিবদমান উভয় পক্ষই বুদ্ধদেবকেই প্রধান মীমাংসক ও মধ্যস্থ বলিয়া মানিয়াছেন; উভয় পক্ষই বুদ্ধদেবের বাণী উদ্ধৃত করিয়া স্বপক্ষ সমর্থন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং যত বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে, সেই সব বাণীর অন্তর্গত অর্থব্যাখ্যা লইয়া।

মিলিন্দ-পঞ্হো (মিলিন্দ-প্রশ্ন) রাজা মিলিন্দ (Menander) ও থের নাগসেনের প্রশ্নোত্তরের সমষ্টি। কথাবত্থুর রচনার ধরণ ইহাতে অনেকটা দেখিতে পাওয়া যায়। দার্শনিক-ভাবে বিচার করিলে কথাবত্থু অপেক্ষা ইহাকে ব্যক্তিগত বৌদ্ধ মতবাদের সম্পূর্ণতর সমন্বয় বলা যাইতে পারে[৩৯]।

যে সময়ে মিলিন্দ-প্রশ্ন রচিত হয় ও বুদ্ধঘোষ বিবিধ সিংহলী টীকা অবলম্বনে গ্রন্থ রচনা করিতেছিলেন[৪০] সেই সময়কে বৌদ্ধ সাহিত্য-রচনার ষষ্ঠ স্তর বলা যাইতে পারে। সিংহলী টীকা ভিন্ন বুদ্ধঘোষ দীঘভানক[৪১], মজ্ঝিমভানক[৪২] ও অন্যান্য মতবাদী থেরদিগের মতের উল্লেখ করিয়াছেন। সুমঙ্গলবিলাসিনীর ভূমিকায়[৪৩] তিনি ঐ সকল থেরদিগের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছেন। এই সকল থের সম্প্রদায় প্রথমে কেবলমাত্র আবৃত্তিকারক সম্প্রদায় ছিল, পরে মতপার্থক্যে বিভিন্ন মতবাদী সম্প্রদায়ে পরিণত হয়।

বুদ্ধঘোষের গ্রন্থাবলী বৌদ্ধ-সাহিত্যের সপ্তম স্তর বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। এই গ্রন্থাবলীর ভিত্তিমূলে নিহিত থাকিবার চিহ্ন দেখা যায়—সমস্ত ত্রিপিটক, মহাকচ্চায়নের গ্রন্থাবলী, কথাবত্থু, মিলিন্দ-পঞ্হো[৪৪], থেরবাদী ভিন্ন অপর উপদেষ্টাদিগের পন্নত্তিবাদ (প্রজ্ঞপ্তিবাদ)[৪৫], বিতণ্ডাবাদীদের মত, পকতিবাদ (প্রকৃতিবাদ) সাংখ্য বা যোগ-দর্শন[৪৬] এবং সিংহলের ভিক্ষুদিগের মতবাদ[৪৭]।

আমরা দেখিলাম, প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায় যে, বুদ্ধঘোষ অথবা থের মহিন্দ (মহেন্দ্র) অথবা প্রাচীন থেরগণ কেহই টীকা ও ব্যাখ্যা রচনা প্রথম প্রবর্ত্তন করেন নাই; কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাদের যে মৌলিকতা ছিল না—এ কথাও স্বীকার করা চলে না। সুত্তনিপাতের কতকগুলি সুত্রের প্রাচীন ব্যাখ্যাপুস্তক 'নিদ্দেস' বুদ্ধঘোষের পরমার্থজ্যোতিকার সঙ্গে তুলনার যোগ্য নহে। মহাকচ্চায়নের পেটকোপদেশ[৪৮], যাহা হইতে বুদ্ধঘোষ কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়াছিলেন, অথসালিনী

৩৯। বুদ্ধঘোষের কথাবত্থু টীকা; ১৮ সম্প্রদায় সম্বন্ধে বসুমিত্রের গ্রন্থ ইত্যাদি।

৪০। Buddhist Manual of Psychological Ethics, pp. XXIII,—XXIV দ্রষ্টব্য।

৪১ ও ৪২। অথসালিনী, ১৫১, ৩৯৯, ৪০৭, ৪২০ পৃষ্ঠা। ৪৩। সুমঙ্গলবিলাসিনী, ১১—১৫ পৃষ্ঠা।

৪৪। অথসালিনী, ১২২, ১১৪, ১১৯, ১২০, ১২২, ১৯২ পৃষ্ঠা।

৪৫। পুগ্গল-পঞ্ঞত্তি Commentary, Pali Text Society, pp. 173—175.

৪৬। অথসালিনী (সিংহলী সংস্করণ), ৩, ৯০, ৯২, ২৪১ পৃষ্ঠা।

৪৭। পুগ্গল পঞ্ঞত্তি Commentary, (সিংহলী সংস্করণ), ১৭২ পৃষ্ঠা। তিথিয়ানম্ অনুপকত্তি-পুরিসাদিকসস বা।—বিশুদ্ধিমগ্গ, ৪০৭ পৃষ্ঠা। কিংপকতিবাদিনাং পকতিবিয় অবিজ্জা পি অকোরণং মূলকোরণং লোকস্সাতি। ৪০৬ পৃষ্ঠা। ৪৮। অথসালিনী, ১৬৫ পৃষ্ঠা।

নহে। স্বয়ং বুদ্ধদেব ও তাঁহার শিষ্য-প্রশিষ্যগণ শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতৃ বুদ্ধঘোষের আবির্ভাবের পথ প্রমুক্ত করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন।

## ২। বুদ্ধঘোষের টীকা সম্বন্ধে সন্ধান

বুদ্ধঘোষের টীকাগুলি সূক্ষ্মভাবে অধ্যয়ন করিলে মনে এমন অনেক প্রশ্নের উদয় হয়, যাহার উত্তর এখন পর্য্যন্ত কেহ দেন নাই। বিশেষ ও প্রধান প্রশ্নটি এই বিসুদ্ধিমগ্‌গ-প্রমুখ ব্যাখ্যাবলীর মধ্যে বুদ্ধঘোষ কতখানি স্বীয় পরিচয় প্রকাশ করিয়াছেন? অপর প্রশ্নগুলি ইহারই আনুষঙ্গিক, যথা—(১) মহাবংশের বিবরণ সত্য বলিয়া ধরিলে দেখা যায়, বুদ্ধঘোষ গয়ার এক ব্রাহ্মণ সন্তান, তিনি বেদ, বেদাঙ্গ, শিল্পকলা ও পাতঞ্জলদর্শন আয়ত্ত করিয়াছিলেন। এখন প্রশ্ন হইতেছে—বুদ্ধঘোষের রচনার মধ্যে ব্রাহ্মণ্য সংস্কার ও পাতঞ্জলদর্শনের কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় কি? (২) থের রেবত তাঁহাকে দার্শনিক তর্কে পরাস্ত করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। থের রেবত ও তাঁহার সাক্ষাৎ কোথায় ঘটিয়াছিল? (৩) কিংবদন্তী আছে যে, বুদ্ধঘোষ ভারতবর্ষে থাকিতেই তাঁহার অত্থসালিনী রচনা করিয়াছিলেন। এই কিংবদন্তীর সমর্থক কোনো যুক্তিসহ প্রমাণ পাওয়া যায় কি? (৪) তাঁহার টীকাতে সিংহলের কোনো জ্ঞানপরিচয় পাওয়া যায় কি? (৫) তাঁহার রচনা হইতে তৎসাময়িক ভারতের সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, দার্শনিক, সাহিত্যিক ও শিল্পকলা-বিষয়ক ইতিহাসের কি বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়? (৬) বৌদ্ধ ও দার্শনিকতত্ত্ব বিশ্লেষণ-সম্পর্কে বুদ্ধদত্ত প্রভৃতি দাক্ষিণাত্যের পণ্ডিতদের সঙ্গে বুদ্ধঘোষের সম্বন্ধ কি? (৭) বৌদ্ধ বা ভারতীয় দর্শনে বুদ্ধঘোষ কি বিশেষ মত বা তত্ত্ব দান করিতে পারিয়াছেন? (৮) উত্তরভারত, দাক্ষিণাত্য ও সিংহলের মধ্যে বুদ্ধঘোষকে কিসের জন্য যোজনশৃঙ্খল বলা যাইতে পারে? (৯) বুদ্ধঘোষের মধ্যে শঙ্করাচার্য্যের কোনো পূর্ব্বাভাষ পাওয়া যায় কি? (১০) ভারতের তথা বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসে লেখক ও দার্শনিক হিসাবে বুদ্ধঘোষের স্থান কোথায়? (১১) বুদ্ধঘোষ যে মহাযান সম্প্রদায়ের কোনো উল্লেখ করেন নাই, তাহার কারণ কি? (১২) বুদ্ধঘোষের দার্শনিক তত্ত্বের মূল সূত্র কি? (১৩) সিংহলের বৌদ্ধ নৃপতি ও পণ্ডিতদের কাছে বুদ্ধঘোষ কতখানি ঋণী? এতগুলি প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে অতগুলি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখিতে হয়। আমরা এখানে মাত্র একটি প্রশ্নের উত্তর প্রমাণ সহ দিতে চেষ্টা করিব।

## ৩। বুদ্ধঘোষের রচনাবলীর মধ্যে তাঁহার পরিচয়

বুদ্ধঘোষ তাঁহার টীকাগুলি ছাড়া নিজের কোনো পরিচয় ও ইতিহাস আমাদের জন্য রাখিয়া যান নাই। অন্যান্য স্থান হইতে যে সব বিবরণ পাওয়া যায়, তাহাও অত্যন্ত অপ্রচুর। মিঃ গ্রে প্রথমে বুদ্ধঘোষের জীবনী, তৎপ্রণীত বুদ্ধঘোসুপ্পত্তি নামক পুস্তকে মহাবংশ শাসনবংশ প্রভৃতি পুস্তক হইতে সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন? ঐ সব পুস্তকে প্রদত্ত বিবরণ বুদ্ধঘোষের জীবনের কয়েকটি স্থূল ঘটনা মাত্র এবং তাহা এই,—

বুদ্ধগয়ার বোধিদ্রুমের নিকটে এক ব্রাহ্মণবংশে বুদ্ধঘোষের জন্ম হয়, বাল্যে তিনি ব্রাহ্মণ